# মঞ্জরী

# সংকরী

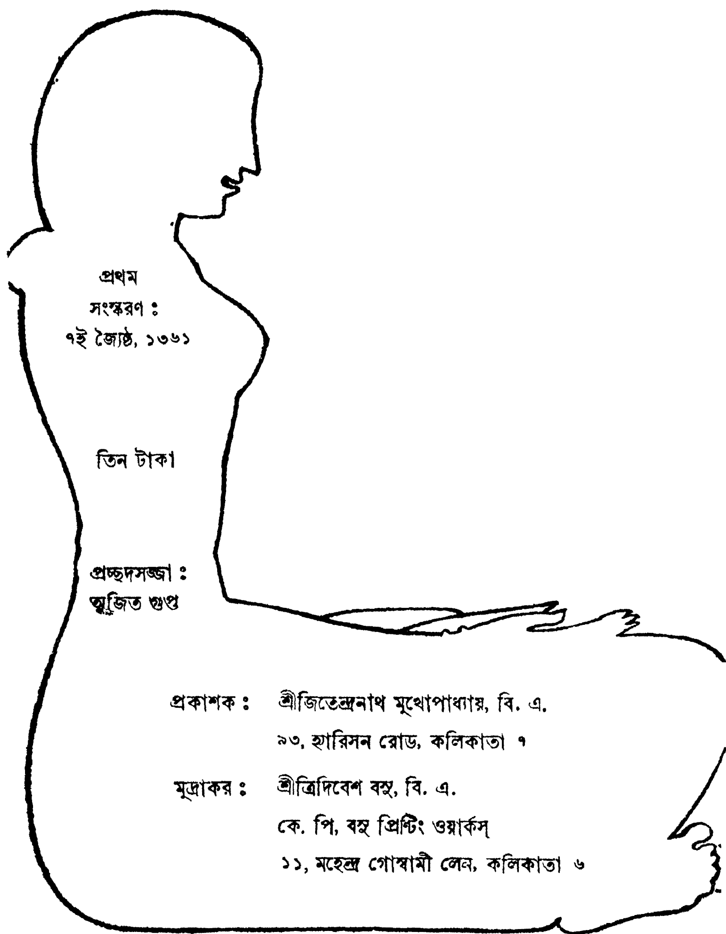
শঙ্কর





ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ হারিসন রোড, কলিকাতা ৭



প্রথম
সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
সুজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

শ্রীমতী উমা ভট্টাচার্য

করকমলেষু—



# ভূমিকা

এই সংকলনের একটি কাহিনীর নাম সংকরী'। কিন্তু গ্রন্থের নামের জন্যেও ওই নামটি নির্বাচন করেছি এই জন্যে যে, এতে 'চলন্তিকা'-য় প্রদত্ত অর্থ অনুযায়ী, 'বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ পদার্থের মিলন' হয়েছে। 'দেশ' ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার জন্যে বিভিন্ন সময়ে লেখা এই গল্পগুলির মধ্যে রচনারীতি, দৃষ্টিভঙ্গী বা বক্তব্যের কিছুমাত্র ঐক্য নেই।

এ বইয়ের গল্পগুলি বিশুদ্ধ গল্প হিসাবেই বিচার্য। মোপাসঁ বা সমরসেট ম'মের গল্পের মতো। এগুলির মধ্যে গল্পাতীত কোনো তত্ত্বের সন্ধান করলে পাঠকের পক্ষে পণ্ডশ্রম এবং আমার প্রতি অবিচার হবে।

—রঞ্জন

| | | |
|---|---|---|
| নবীনা | ... | ১ |
| সান মার্কো | ... | ২২ |
| আকাশবাণী | ... | ৭৬ |
| সংকরী | . | ৮৮ |
| বিজয়িনী | .. | ১৩৯ |
| অনুলেখক | . | ১৫৬ |
| শেষ কথা | ... | ১৭২ |

# নবীনা

ভদ্রলোক আবার বললেন, "ওঁকে কি তবে কাল একবার নিয়ে আসব ?"

আমি বললুম, "না, না, তেমন তাড়া তো কিছু নেই, রিপোর্টগুলি আমি দেখলুম তো, সব কিছু একেবারে নর্ম্যাল। কোনো গোলমালই হওয়া উচিত নয়।" বলে হাসলুম। আশা করি, আমার হাসিটা যত চেষ্টিত ছিল ঠিক ততটা অনাস্তরিক দেখায় নি।

নতুন ডাক্তারের পসার বাড়াতে হলে রোগীর প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন কববার উপায় নেই। তাই আবার বললুম, "দিন পনেরো পরে একবার দেখা যাবে, এখন কিছু তাড়া নেই।" আরও হেসে বললুম, "ফজলুল হক কী বলেছিলেন মনে নেই ? বিধি সময় বেঁধে দিয়েছেন। তাড়া করে লাভ নেই।" এই রসিকতাগুলি আমার ভালো লাগে না, কিন্তু রোগীরা পছন্দ করে।

পরুরুচি বোল্‌না—সাফল্যের জন্যে এই মূল্য দিতেই হয়।

আসল কথাটা হচ্ছে, আমার নিজের তাড়া ছিল। সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। রাত আটটায় তরুণের বিয়ে। তার আগে আমায় মেসে ফিরে পোশাক বদল করে নিতে হবে। তারপর তরুণের বাড়ি, সেখান থেকে বরানুগমনে বালিগঞ্জ যাত্রা। দীর্ঘ পথ। সময় অল্প। আমার সত্যি তাড়া ছিল।

কারও বিয়েতে আমি আজকাল সাধারণত যাই নে। কিন্তু তরুণের কথা আলাদা। সে আমার পুরনো বন্ধু। পুরনো মানে মেডিক্যাল কলেজে

আসবারও আগে। প্রথম চেনা সেই স্কটিশে আই. এস-সি. পড়বার সময়। দু'বছরের সহপাঠিত্ব, কিন্তু দুজনের দুজনকে এমন ভালো লাগল যে পরে যখন তরুণ বিজ্ঞানের আলো ছেড়ে আর্টের কুয়াশায় মুক্তি খুঁজল, আর আমি ডাক্তারির মতো ব্যবহারিক বিদ্যায় আত্মনিয়োগ করলুম, বন্ধুত্ব তখনও অটুট রইল। আমি মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি মির্জাপুরে একটা মেসে উঠে এলুম, তরুণও তাই করল। যদিও তার কলেজ রয়ে গেল স্কটিশ চার্চ। আরও পরে তরুণ কমার্স পড়ে অ্যাকাউণ্ট্যান্ট হোলো। আমি তো ডাক্তার। তবু ( নাকি সেই জন্যেই ? ) অন্তরঙ্গতা অক্ষুণ্ণ রইল। বস্তুত, তরুণের পরে আর আমার নতুন বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে হয় নি। অতএব, বিয়ে সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক না কেন, তরুণের বিয়েতে না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, না গেলে এমন কি যেতে দেরি হলে, আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতুম না। তাই এত তাড়া।

তাড়া মানেই দেরি। তখন ট্রামের সামনে বাস এসে দাঁড়াবে, বাসের সামনে গরুর গাড়ি। ডাক্তারের সামনে পুরনো রোগী। নতুন ডাক্তার। এড়াবার উপায় নেই। কুশল জিজ্ঞাসা করতেই হয়। অন্যের বেলায় যে প্রশ্নের উত্তরেরই প্রয়োজন হয় না, ডাক্তারের বেলায় তার উত্তরের শেষ নেই।

"যোগেশবাবু যে ? ভালো তো ?"

"তা ভালোই ছিলুম। কিন্তু কাল হোলো কি, কি জানেন, এই গলদা চিংড়ির লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারি নে। কিন্তু কাল আমার বড় শ্যালা, ওই যে যিনি লয়েডস ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু, তা ইনচার্জ বললেই হয়, ওপরে এক ছোকরা সাহেব এসেছে সে কিছুই জানে না, আমার শ্যালার কথায় ওঠে বসে, হ্যাঁ, কি বলছিলুম, ওই শ্যালা পাতি-

পুকুরে গিয়েছিল মাছ ধরতে। হ্যাঁ মশাই, ওই এক বাতিক ওর। তা যা বলছিলুম, সারা দিন বসে বসে আমার নস্কর মশাই কিছু পান নি। হে-হে। শেষে বিরক্ত হয়ে ফেরবার সময় শ্যালা এক রাশ গলদা চিংড়ি কিনে আনলে। সত্যি এক রাশ। আমার গিন্নী আবার—জানেন তো?"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হয়, ভান করতে হয় যে শুনতে ভালো লাগছে। সেদিনও তাই হোলো। এমনি একজন ভূতপূর্ব ( অতএব, আশা রাখি, ভবিষ্যৎ ) রোগীর সঙ্গে দেখা হোলো। তাঁর সমস্ত কাহিনী শুনতে হোলো। ট্রামে উঠতেই সাতটা বেজে গেল।

ট্রামে উঠেও দেখি একেবারে অপর প্রান্তে আমার একজন রোগী দাঁড়িয়ে। রোগী মানে রোগীর স্বামী। দেখেই চিনতে পারলুম, তবু মুখ ফিরিয়ে নিলুম। মনে মনে বললুম, 'আমার রোগীর সংখ্যা অল্প। তাই তো আমার সব রোগীর মুখ ও নাম মনে থাকে। আমি যদি কেদার দাস হতুম, বা বিধান রায়,—যা একদিন হবই—তা হলে কি আমার মনে থাকত সব রোগীর কথা, তাদের নাম, ধাম, অসুখ—সব বৃত্তান্ত? অসম্ভব। তখনি আমি আমার রোগীদের পথে চিনতে না পারলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না। আজও তাই হোক।'

আমি ( ডাক্তার হিসাবে ) বিধান রায় হব—এই কথাটা মনে হলেই ভালো লাগে। কিন্তু তখন আমি আমার রোগীদেব চিনব না, তারা সবাই আর আমার কাছে বিভিন্ন জীবন্ত এক-একটি ব্যক্তি থাকবে না, অসংখ্য রোগীদের মধ্যে কে কোথায় হারিয়ে যাবে, জীবন্ত মানুষগুলি সব 'কেস্' হয়ে যাবে—এটা ভাবতে ভালো লাগল না। আমি সফল হতে চাই, কিন্তু হৃদয়হীনতায় সাফল্যের যে মূল্য দিতে হয় তা দিতে বাধে।

বাড়ি পৌঁছোলুম, তখন সবাই চলে গেছে বিবাহবাসরে। বাড়ির সামনে একটাও হাঁসওয়ালা গাড়ি না দেখে তা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হোলো না। আমি ভাবলুম, ভালোই হোলো। সারাটা পথ এক-শহর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে এবার একা একা বিয়ে-বাড়িতে যাওয়া যাবে। বিয়েটা ( এক স্বামী-স্ত্রীর কাছে ছাড়া ) এমন কী একটা অসাধারণ ঘটনা যে আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে তা প্রচার না করলে হবে না ?

বিয়ে-বাড়িতে গিয়েও আমি প্রায় সকলের শেষে পৌঁছোলুম। তরুণকে তখন বিয়ের আসরে নেওয়া হয়ে গেছে। কর্ণবিদারী কোলাহলের মধ্যে ইতস্তত অতিথিবৃন্দ আহারে ব্যস্ত, যেমন হয়ে থাকে প্রত্যেক বাঙালী বিয়েতে। কোনোক্রমে খাওয়া সেরে ট্রাম ধরা, বিয়েটা যেন একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

আমি পৌঁছোতেই তাই কন্যাকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন এসে বললেন, "পাতা পড়েছে, এখনি বসে গেলেই ভালো।"

আমি এসব উপরোধ উপেক্ষা করে বিয়ের জায়গায়, অর্থাৎ ছাতের উপরে, যেতে চেষ্টা করলুম। আমি খেতে আসি নি, আমি আমার একমাত্র বন্ধুর বিয়েতে এসেছি।

কিন্তু বরের এক মাইলের মধ্যে আমার মতো কারও যাবার উপায় ছিল না। চতুর্দিকে মহিলাপরিবেষ্টিত হয়ে বেচারী তরুণ যথাসাধ্য আশানুরূপ পরিহাসে ব্যস্ত ছিল।

সত্য বলতে কি, তরুণ পারে এগুলি ; আমি পারি নে। মেয়েদের-ভালো-লাগে এই রকমের রসিকতা ওর সহজেই আসে। আমার আসে না। রোগী নয়, আত্মীয়া নয়, এই রকম কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি

অত্যন্ত বিব্রত বোধ করি। বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পাই না, কলারের তলায় শুধু ঘামতে থাকি। তার উপর যদি একের বদলে এক ঝাঁক মেয়ে হয় তাহলে তো কথাই নেই।

আমাকে বরং এক দল ম্যান-ঈটার দিয়ে ঘিরে রাখো, কম গাল দেব।

আমি তাই ছাতের স্বল্পালোকিত একটা কোণে দাঁড়িয়ে রইলুম, সেখান থেকে আমি সব কিছু দেখতে পাব কিন্তু আমাকে কেউ দেখবে না। এই ভূমিকাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। জীবনে কখনও ক্রিকেট খেলি নি, কিন্তু ক্রিকেট খেলা দেখতে আমার ভালো লাগে। জীবনেও আমার স্থান মাঠে নয়, গ্যালারিতে। মঞ্চে নয়, রীয়ার স্টলে।

কিন্তু নাটক ও খেলায় বিবাম আছে। তখন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে ওঠে, অন্যান্য দর্শকের অলস চক্ষু শিকার-সন্ধানে ব্যাধের মতো ইতস্তত চতুর্দিকে বিচরণ করতে থাকে। আমিও সেই দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পেলুম না। একজন অতিব্যস্ত ভদ্রলোক দ্রুতপদে এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে যেতে আমায় দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। সর্বাঙ্গে স্বেদ ও হলুদের প্রলেপ থেকে বুঝতে কষ্ট হোলো না যে তিনি কন্যাপক্ষের কর্তাব্যক্তি। অতিথিদের, বিশেষ করে বরযাত্রীদের, পরিপূর্ণ তুষ্টিবিধানই তাঁর একমাত্র চিন্তা। আমাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি কাছে এগিয়ে এলেন। আসতে আসতে বললেন, "আসুন, আসুন, আর সবাই বসে গেছে, এর পরে ট্রাম—"

ভদ্রলোক কাছে এসে কথাটা যেন আর শেষ করতে পারলেন না। আমিও ভদ্রলোককে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলুম। বিরতির পরে তিনি বললেন, "ও, আপনি? তা—তা—এখনও আপনার খাওয়া হয় নি বুঝি?

তা—আসুন না আমার সঙ্গে, আর সবাইয়ের খাওয়া যে হয়ে গেছে প্রায়। আসুন।"

স্পষ্টতই ভদ্রলোক আমাকে চিনেছেন। আমারও মনে হোলো, এঁকে কোথাও দেখেছি। কিন্তু অন্তত এই একবার আমার স্মৃতিশক্তির গর্ব খর্ব হোলো। কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, ভদ্রলোক কে, বা কোথায় তাঁকে দেখেছি, বা কবে আর কেন। তবু বিস্মৃতি গোপন করে চেনবার ভান করে বললুম, "আমি এখন খাব না। যদি কিছু মনে না করেন, তরুণের সঙ্গে একবারটি দেখা করে পরে নীচে যাব।"

অনিশ্চিতভাবে ভদ্রলোক বললেন, "ওঁকে কি আর এখন পাবেন? বেশ, পরেই না হয় খাবেন। আমাদের কিন্তু সব আয়োজন তৈরী। সময় হলেই সোজা দোতালার ঘরে চলে আসবেন।"

ভদ্রলোক বিদায় নিলে আমি মনে মনে আমার রোগীর নামতালিকায় তাঁর সন্ধান করলুম। বার বার মনে হোলো যে, তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলুম না কেন—সন্তান হয় না বলে, না কি সন্তান আসন্ন বলে?

আমি ওঁর কথা ভাবতে ভাবতে ছাতের অপর প্রান্তে আবার আমার বন্ধু তরুণকে দেখছিলুম। ভাবছিলুম, বছর না ঘুরতেই সে-ও হয়তো আমার কাছে আসবে খবর দিতে—আর কতদিন বাকি, কোনো ভয়ের কারণ আছে কিনা, ইত্যাদি।

কিন্তু অত দূরের কথা চিন্তা করবার সুযোগ ছিল না। আমার চোখের সামনে হিন্দু বিয়ের আগেকার নানা অনুষ্ঠান চলছিল মহাসমারোহে। এক সঙ্গে অন্তত কুড়ি জন মহিলা কুড়ি রকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ওগুলি

থামলে চলছিল সমবেত উলুধ্বনি। এই প্রথাগুলি নিশ্চয়ই এক সময়ে সুন্দর ছিল। এখনও অনেকে এর মধ্যে হিন্দুধর্মের অজেয় ঐতিহ্য ও মাধুর্য আবিষ্কার কবে অভিভূত হন। কিন্তু আমি ডাক্তাব মানুষ। অত কবিত্ব আমার আসে না। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপাবটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও গ্রাম্য বলে মনে হয়। আমি—

কিন্তু থাক্ আমার কথা। আমি তো আব বব নই। তরুণ তার বিবাহানুষ্ঠানেব সব কিছু প্রাণ ভরে উপভোগ করছিল, সেইটেই বড কথা।

ক্রমে বিয়েব লগ্ন এলো।

রাত তখন অনেক। বেশিব ভাগ অতিথিই আহারান্তে বিদায় নিয়েছেন। বিবাহবাসবে বড়ো জোর জন কুড়ি লোক। আমি সকলেব অগোচরে পিছনেব একটা জায়গায় বসে যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছিলুম। অশুদ্ধ, অশ্রাব্য, অবোধ্য সংস্কৃতে পুরোহিত যা খুশি মন্ত্র উচ্চাবণ করছিলেন, তরুণও ( যে কিনা সংস্কৃত জানে ) সেগুলি ঠোঁট নেড়ে পুনরুচ্চাবণ করছিল।

পবে শুভদৃষ্টির সময় এলো। তরুণের মুখে আশা না আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছিল বলতে পাবব না। আমি তরুণকে দেখেছি, তরুণেব স্ত্রীকে দেখতে আমিও তরুণেব চাইতে কম কৌতূহলী ছিলুম না।

দুজনে এসে দুটো চিত্রিত পিঁড়ির উপব দাঁড়াল। যে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগে আমাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলছিলেন, তিনিই দুজনের উপর একটা চাদর না কি বিছিয়ে দিলেন। তরুণের দিকে আমি এতক্ষণ তাকাই নি, কিন্তু চাদরের অন্তরালে সে অদৃশ্য হতেই আমি ক'নের কথা ভুলে গিয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আবার যখন তরুণকে দেখা গেল তখন তাব আনন আনন্দে উদ্ভাসিত।

যেন তার সব কিছু প্রার্থনার উত্তর নিমেষে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেন এক মুহূর্তের মধ্যে তার এতদিনের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে।

আশাপূরণ নয়, ওটা সামান্য ব্যাপার। তখন তরুণের মুখ দেখে মনে হোলো, হঠাৎ তার জীবন যেন পূর্ণতা লাভ করল। আর কিছু চাইবার নেই। এবার এক দুই হোলো। এর পর থেকে এদের দুজনের মিলিত জীবনে দুজনের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হবে শুধু একটি সাধনায়। দুই তখন এক হবে। দুজনের মিলিত আত্মা প্রদীপশিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওদের মিলিত নীড়টিকে মন্দির করে তুলবে। ধ্যানমগ্ন সাধকের পরিপূর্ণ আনন্দের আভাস সত্যি তখন প্রতিফলিত হয়েছিল তরুণের মুখে।

সে মুহূর্তে আমি সত্যিই প্রায় ক্যাথলিকদের মতো বিশ্বাস করতে পারতুম যে মানুষের বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হয়, যে কোনো অদৃশ্য দেবতা এসে একটি পুরুষকে মিলিয়ে দিয়ে যান একটি মেয়ের সঙ্গে।

কিন্তু বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হলেও, বিবাহিত জীবনটা কাটাতে হয় এই পৃথিবীর কারাগারে। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে আমার বন্ধু বোধ হয় বিয়ের কাছ থেকে বড় বেশি প্রত্যাশা করছে। শেষে নিরাশ হবে না তো? বিয়ের পরে তো দেবপুরোহিতগণ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন বর দেবার জন্যে অবশিষ্ট রইবেন শুধু তরুণের স্ত্রী নবীনা দেবী। তিনি কী ভাবছিলেন সেই মুহূর্তে?

পঞ্চপ্রদীপ না কি যেন একটা আলো নিয়ে একটি মহিলা বধূর মুখের চার দিকে ঘোরাচ্ছিলেন। আবার চতুর্দিকে উলুধ্বনি উঠল। এত কোলাহলে আর এত বেশি আলোয় আমি আমার বন্ধুপত্নী নবীনা দেবীকে আর ভালো করে দেখতে পেলুম না।

আমি বেশ অনেকটা দূরেও দাঁড়িয়ে ছিলুম। তবু বুঝতে কষ্ট হোলো না যে, নবীনা সুন্দরী। শুধু রূপ নয়; দৃষ্টি ও শ্রুতির শত বাধা সত্ত্বেও বুঝতে পারলুম যে, নবীনার মুখে শুধু বুদ্ধির দীপ্তি ছিল না, সারা মুখে ও দেহে এমন একটা স্নিগ্ধ নির্মল লাবণ্যের আবেশ ছিল যা বোধ হয় এই বাঙলা দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এবারে যেন বুঝতে পারলুম তরুণের মুখের অভিব্যক্তির পূর্ণ মর্মার্থ।

বস্তুত, আমিও মনে মনে তরুণের যোগ্যা স্ত্রীর যে রূপটি কল্পনা করেছিলুম, নবীনা ঠিক তাই, ঠিক তাই।

কিন্তু বিবাহ-বাসর এমন নির্বিঘ্ন রূপোপভোগের প্রশস্ত স্থান নয়। তাই সেই ভদ্রলোক আবার এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কিছুতেই আমাকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। বললেন, "তরুণবাবুও আপনার খোঁজ করছিলেন। কিন্তু আজ কি তার সঙ্গে দেখা হবে? দেখছেন তো কী ভীড় ওখানে ওঁকে ঘিরে! তার চেয়ে চলুন খেয়ে নেবেন, ইতিমধ্যে বিয়ের ঝামেলাটা চুকে যাবে। পরে বরং ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন।" ভদ্রলোক আমি আর দূরের বরবধূর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই কিছুই আর দেখবার উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আবার বললেন, "আসুন আমার সঙ্গে।"

এখনও কিছুতেই ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম না। কিন্তু তিনি এমন বার বার খেতে যেতে অনুরোধ করতে লাগলেন যে, কী করে এড়াব তাও ভেবে পেলুম না। যেতেই হোলো তাঁর সঙ্গে। খেতেই হোলো অন্যান্য জন কুড়ি অতিথির সঙ্গে। ভদ্রলোক নিজে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সহ-কারীদের পরিবেশন তত্ত্বাবধান করছিলেন। অপর ভোক্তাদের এ কথা মনে

হয়েছে কিনা জানি নে, আমার নিজের একটু অস্বস্তি লাগছিল যে আমার দিকে যেন বড়ো বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল।

বিয়ে-বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে, উপরের ছাত থেকে অনবরত কেউ না কেউ কোনো না কোনো অজুহাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছিলেন। আমারও বার বার সেদিকে না তাকিয়ে উপায় ছিল না। হিন্দু বিবাহের নানা জটিল উপচারের বিশদ বিবরণ আমি জানি নে। অনুষ্ঠানের কোথাও কোনো ছেদ পড়ে থাকবে। হয়তো বা অনুষ্ঠানেরই অন্য কোনো অংশের জন্যে কন্যাকে বিবাহবাসর থেকে নীচে আনবার দরকার হয়েছিল। আগে কয়েকজন মহিলা, পিছনে আরও কয়েকজন, মাঝখানে বধূ। চিনতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। এবারে আমি অল্পবিস্তর স্বাভাবিক আলোয় আমার বন্ধুপত্নী নবীনাকে দেখতে পেলুম। আতিথ্যপরায়ণ ভদ্রলোককেও এবারে চিনতে পারলুম।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে আমি বিয়ে-বাড়ি থেকে বিদায় নিলুম। তরুণের সঙ্গে আর দেখা করলুম না। ভদ্রলোককে বলে এলুম তরুণকে বলতে যে, আমি এসেছিলুম, জরুরী একটা কাজের জন্যে ওর সঙ্গে আর দেখা করে যেতে পারলুম না।

এতক্ষণে আমার স্মৃতিপটে এক বছর আগেকার একটা কাহিনী কুশীলব-সমেত ভেসে উঠেছিল।

মনে আছে। স্লিপে লেখা ছিল—সতীশ সেন উইথ সন্ধ্যা সেন।

যথারীতি অভিবাদন ও আসন গ্রহণের পরে আমি বললুম, "হ্যাঁ, বলুন।"

আমার ঘরে তখনও বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে কী যেন একটা কাজ করছিল।

ভদ্রলোক ইঙ্গিতে জানালেন যে, একেবারে একা থাকলে ভালো হয়। এটা অস্বাভাবিক অনুরোধ নয়। আমি বেয়ারাকে যেতে বললুম।

ভদ্রলোক বসলেন। বললেন তাঁর বক্তব্য। বিব্রত, বিপন্ন; কিন্তু নিশ্চিত যে আমি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব না।

আমি সন্ধ্যা সেনের দিকে তখনও একবারও তাকাই নি। মহিলা—মেয়েটি বললেই ঠিক হয়, একটা কালো চশমা পরে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে একেবারে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি বিরক্তি এবং ক্রোধ দমন করে ভদ্রলোককে আস্তে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়, ইংরেজীতে, বললুম, "আপনি ভুল দোকানে এসেছেন।" বলেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

সন্ধ্যা সেন এতক্ষণে কথা বললেন, "দাদা, তুমি বরং বাইরে গিয়ে বসো। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলব।"

নিতান্ত সাধারণ এই কথাগুলি। কিন্তু এই কয়েকটা সামান্য কথায় নিমেষের মধ্যে আমার ঘরের কার্বলিক সাবানের গন্ধ যেন অন্য কোনো সুরভিতে পরিণত হোলো। সমস্ত আবহাওয়াটার এমন আকস্মিক আমূল পরিবর্তন হোলো যে, আমার ডাক্তারী সত্তা কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার সামনে আমার রোগী বসে নেই, যার হৃদ্‌যন্ত্র আমি স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করব। সন্ধ্যা দেবীর কাঠের চেয়ারটা সিংহাসন বলে মনে হোলো—সেখান থেকে সম্রাজ্ঞী সবাইকে আদেশ দেবেন আর সবাই তা নিঃশব্দে মেনে নিয়ে ধন্য হবে। সন্ধ্যার কণ্ঠেই কী যেন একটা একেবারে বিভিন্ন রকমের স্বর ছিল যা অমান্য করা আমার মতো লোকের পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু শুধু আমাব মতো লোকের নয়। সন্ধ্যা দেবী যাঁকে অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনিও বিনা প্রতিবাদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ঘরে রইলুম সন্ধ্যা আর আমি।

সন্ধ্যা বললে, "বসুন।" আমি বসলুম।

সন্ধ্যা তার চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলল। আমি তাড়াতাড়ি তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একটা কাগজ পডবার ভান করলুম।

সন্ধ্যা বললে, "কী আপনাব আপত্তি?"—জিজ্ঞাসা নয়, জেরা।

আমি জানতুম, তর্কে প্রবৃত্ত হলে আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বললুম, "কী কী আপত্তি হতে পারে তা আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই।"

"তা ছাড়া?"

"নীতিবিরুদ্ধ।"

"নীতি! কোন্ নীতি?"

আমি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছিলুম যে, তর্কের ফাঁদে পা দিয়ে ভুল করছি, নিজের পবাজয় ডেকে আনছি। হয়তো শুধু তর্কে পরাজয় নয়, আরও ভয়ানক কোনো পরিণাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার স্বাধীন ইচ্ছা বলে কোনো কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। বললুম, "ক্ষমা করবেন, আমাকে এমন অন্যায় অনুরোধ আপনি করবেন না।"

"আপনি শুধু অনুবোধ কবতে বারণ করে ক্ষান্ত হন নি, অনুরোধটাকে অন্যায় বলেও অভিহিত করেছেন। আমার আপত্তি সেইখানে। তার চেয়ে সরাসরি বলেন না কেন, আপনি ভয় পেয়েছেন, আপনার সাহস নেই একজন অসহায় মেয়েকে তার জীবনের চরম বিপদ থেকে বাঁচাতে?"

সন্ধ্যা সত্যই বলেছে। কিন্তু হই দুর্বল, পুরুষ তো। একজন অপরিচিতা মেয়ের হাতে এমন অপমান আমিও বিনা প্রতিবাদে গলাধঃকরণ করতে পারলুম না। নির্বোধের মতো বললুম, "বিপদ আপনি আসে নি।"

"না, তা আসে নি। আপনারই মতো কাপুরুষ আর একজনের স্কন্ধে ভর করে এসেছে।"

সন্ধ্যা আমার কাছে ভিক্ষাপ্রার্থিনী, কিন্তু তার বাক্যে কোথাও এতটুকু আবেদনের সুর ছিল না। বরং তিরস্কারের ঝাঁজ ছিল প্রতিটি কথায়।

আমি সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি নই, কিন্তু সন্ধ্যাকে সে কথাটা বলবার সাহস আমার কিছুতেই হোলো না। আমি শুধু আবার ক্ষীণস্বরে বললুম, "আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি নতুন ডাক্তার। দরিদ্র থাকব, কিন্তু অসদুপায়ে ধনী হব না, আমার পকেট শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হোক, কিন্তু বিবেক বিক্রয় করে তার স্ফীতি ঘটাবার দুর্মতি আমার যেন কখনও না হয়।"

ঠিক এই কথাগুলি সন্ধ্যাকে বলতে পেরেছিলুম কিনা মনে নেই, কিন্তু সত্যি যে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে অসহায় ভাবে আমার ভীত আত্মার জন্যে প্রার্থনা করেছিলুম তা আজও মনে আছে। সন্ধ্যা তার পরে উঠে দাঁড়াল; আমি ভাবলুম, ঈশ্বর, তুমি আমাকে মহাপাতক থেকে ত্রাণ করেছ। আমি অর্থের লোভে আত্মবিক্রয় করি নি। মোটা টাকা রোজগার করবার সুযোগ গেল, কিন্তু আমার বিবেক অক্ষত রইল। ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ।

কিন্তু সন্ধ্যা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে তার ব্যাগটা খুলে একটা একটা করে আটটা টাকা গুনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বললে, "এটা আপনার ফীর চেয়ে কম নয় আশা করি।"

সন্ধ্যার কণ্ঠে আবার এই সামান্য কথাগুলি এমন শ্লেষপূর্ণ ও অবজ্ঞামিশ্রিত শোনাল যে, আবার নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে হোলো। সন্ধ্যার দাদার উপর রাগ করা সহজ ছিল, সন্ধ্যার উপর রাগ করা অসম্ভব।

সে যদি অসহায় ভাবে কাঁদত, জানতুম কী করে তাকে তার পূর্বতন দুষ্কৃতির ( বা দুর্বলতার ) কথা স্মরণ করিয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়। সে যদি চটুলা সুলভা রমণী হোতো, জানতুম কী করে তাকে অপমান করে বের করে দিতে হয়।

কিন্তু আবেদন নিয়ে এসেও যে দাবি করে, যার কথায় কোথাও এতটুকু অনুতাপের কোমলতা নেই—তাকে নিয়ে কী করব? দোষ স্বীকার না করে যে অপরকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করে, তার কী বিধান করব?

শুধু বললুম, "থাক্, ফী দিতে হবে না। আমি তো আপনার জন্যে কিছু করতে পারলুম না।"

"পারলেন না নয়; বলুন, করলেন না।"

আবার অভিযোগ। আবার আমার পৌরুষের উপর কশাঘাত। নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে আর একবার সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে দেখেছি; ওই দৃপ্ত চোখ দুটোর দিকে বেশিক্ষণ তাকাবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বুঝেছি যে সন্ধ্যার ব্যক্তিত্বের সামনে আমার সকল প্রতিরোধ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাই কিছু না বলে চুপ করে রইলুম।

সন্ধ্যা সামান্য বিরতির পরে বললে, "অর্থাৎ একটি অজাত অবাঞ্ছিত প্রাণীর বিনাশের দায়িত্ব এড়িয়ে দুটি প্রাণীর হত্যার অপরাধ বরণ করে নিলেন।"

আমার কিছু বলবার ছিল না।

একটু থেমে সন্ধ্যা বললে, "সেইজন্যেই আপনাকে দ্বিগুণ ফী দিয়েছি।"

এবারে শুধু ব্যক্তি হিসাবে আমাকে অপমান করা নয়, শুধু সমগ্র পুরুষ জাতিকে অপমান নয়, পুরো ডাক্তারী পেশাটার অপমান। তবু আমার জিহ্বায় কী পক্ষাঘাত হয়েছিল বলতে পারব না, প্রতিবাদে কোনো একটি বর্ণ উচ্চারণ করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল।

পরবর্তী সমস্ত ঘটনার স্মৃতিই আমার অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে আছে সন্ধ্যাকে বলেছিলুম, "আপনার সব কথা শুনব, শুধু তার আগে আপনার দাদাকে বিদায় করে দিতে হবে।"

গোড়াতে বিশ্বাস করে নি, কিন্তু পরে রাজী হয়েছিল।

তার পর? স্পষ্ট কিছু মনে নেই। মনে আছে, আমার তখন মনে হয়েছিল স্টেফান্ ৎসাইগের 'এমক্' গল্পটা। মনে আছে, আমি সে গল্প সন্ধ্যাকে শুনিয়েছিলুম। আর শুনিয়েছিলুম ফরাসী নাট্যকার ব্রিয়োর 'মাতৃত্ব' নাটকের গল্প।

আমার সংকীর্ণ ভারতীয় বিবেক ততক্ষণে সার্বজনীন উদারতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। আমি তখন শুধু হিপোক্রেটিসের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ চিকিৎসক ছিলুম না। আমি তখন যুক্তিবাদী। পাপপুণ্যের অবান্তর কুসংস্কার তখন আমার প্রভু ছিল না; আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুরুষজাতির ক্রটিস্খালন; নীতির ভয় ছিল না, আইনের ভয় ছিল না, একমাত্র প্রার্থনা ছিল সন্ধ্যার কোনো কাজে আসা, তার শাপমোচনে সহায়তা করা।

করেছিলুম।

কিন্তু এর আগে যা কিছু লিখেছি তার সবগুলি মিথ্যা কথা। ৎসাইগ

বা ব্রিয়ো আমাকে অজুহাত জুগিয়েছেন মাত্র, আমার একমাত্র সত্যকার উদ্দেশ্য ছিল সন্ধ্যাকে আমার কাছে ঋণী করা।

জটিল কোনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল না। সামান্ত অপসারণের পরে সন্ধ্যা যখন একান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আমার বসবার ঘরে ফিরে এলো, আমি বললুম, "আশা করি এবারে আর আমাকে কাপুরুষ মনে করবেন না।"

সন্ধ্যা একটু হাসল। সে হাসির অর্থ যেন এই যে সন্ধ্যার আদেশ অমান্য করবার অক্ষমতা প্রদর্শন করে আমি আমার কাপুরুষতাই বেশি করে সপ্রমাণ করেছি।

কিন্তু তখন আমার এত সব বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। সন্ধ্যা যে হাসছিল সেইটেই আমার সকল পরিশ্রমের পর্যাপ্ত পুরস্কার ছিল।

সন্ধ্যা বললে, "অনেক—অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমি যাব।"

এতক্ষণে আমার ভয় ঘুচে গিয়েছিল। সন্ধ্যাব সহাস্য আনন দেখে আমার নিজেরও আনন্দের অন্ত ছিল না। বললুম, "আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে?"

সহসা সন্ধ্যা গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, "আর তো দেখা হবে না।"

বলেই সন্ধ্যা আবার তার ব্যাগ খুলে কতকগুলি—অনেকগুলি—নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। এবারে যেন দাম দেবার পালা। আমি যা করেছি সন্ধ্যার জন্যে, তার মূল্য যেন একশো টাকার নোটের সংখ্যা দিয়ে গোনা যায়! যেন অর্থ ছাড়া সংসারের মূল্য নিরূপণের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। যেন সব ঋণের শোধবোধ হয়ে যায় রাজার মার্কাওয়ালা কতকগুলি কাগজের হাতবদল হলে!

সন্ধ্যাকে বললুম সে কথা। বললুম, "আমি ভীরু কাপুরুষ হতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এমন জঘন্য ধারণা আপনি করে বসেন নি যে শুধুমাত্র টাকার জন্যেই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি। আমি—"

"তবে?"

আমি তখন ডাক্তারও নই। সন্ধ্যার বিনীত দাস মাত্র। বললুম, "থাক্। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।"

"অর্থাৎ অনেক কিছু দিতে হবে। কিন্তু তা তো পারব না, ডাক্তারবাবু। তার বদলে বরং এগুলো রেখে দিন। আমার পাওনাও একজন এই দিয়েই শুধেছিল, আমার দেনাও তাই দিয়ে শুধলুম। আপনার কাছে সত্যিই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রইলুম।"

আমি তখন কৃতজ্ঞতা চাইছিলুম না। ওই একান্ত লৌকিক অনুভূতিটাতে আমার তখন কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। আমি আমার বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ করবার বিনিময়ে যে পুরস্কার চাইছিলুম তা দুটো ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার দিয়ে প্রতিশোধ্য নয়।

কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু চাইবার না ছিল সাহস, না উপায়। আমার টেবিলের উপরে এক তাড়া নোট অবহেলিত হয়ে পড়ে রইল।

একেবারে চলে যাবার আগে সন্ধ্যা বললে, "সত্যি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু হ্যাঁ, আমি কে বা কোথায় থাকি তা জানবার দয়া করে কিছুমাত্র চেষ্টা করবেন না। তাহলে আমার যতখানি উপকার করেছেন তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি ক্ষতি করবেন। আপনারও লাভ হবে না। বরং—"

"বরং?"

"থাক, জানি আপনি ওসব কিছু করবেন না। আপনাকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার।"

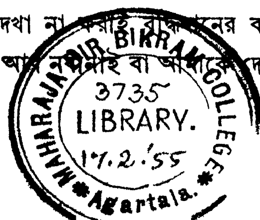
নিশ্চয়ই আমার সমস্ত সত্তা চেয়েছিল সন্ধ্যার অনুধাবন করতে। জানতে যে, সে কোথায় থাকে, যেন আমাদের সেই ডাক্তারী দেখাই শেষ দেখা না হয়। কিন্তু, ওই যে বলছিলুম, আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আদেশের অংশমাত্র অমান্য করবার ক্ষমতা আমার লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমি সেই আমার টেবিলের কাছে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাব চলে যাবার শব্দ শুনলুম। প্রথমে পাশের ঘরে, তার পবে রাস্তায় গাড়ির রওনা হবার শব্দ। কে জানি না, কোথায় গেল জানি না, আর কখনও দেখা হবে না, অথচ আমাকে দিয়ে সে সেই কাজ করিয়ে নিয়ে গেল, যাতে এতটুকু গোলমাল হলে শুধু সন্ধ্যারই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হোতো না, আমাব নিজেবও। কেন সন্ধ্যা অপরিচিত আমার উপর এত আস্থা অর্পণ কবেছিল? আমি কী করে সমস্ত বিপদের কথা বিস্মৃত হয়ে অপরিচিতা এক বোগিণীব জন্যে এমন সর্বনাশা ঝুঁকি নিয়েছিলুম? কিসের লোভে? কিসেব আশায়? কার জন্যে?

দ্বিতীয় উত্তর নেই। সন্ধ্যা, ওরফে, নবীনাব জন্যে।

বলা বাহুল্য, এর পরে আমার তরুণেব সঙ্গে দেখা করবার উপায় ছিল না। বিয়ের রাত্রেও না, তার পরেও না। তরুণকে আমি মিথ্যা বলতে পারতুম না কোনো মতেই, এদিকে সত্য বলবারও উপায় ছিল না।

এ অবস্থায় দেখা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বন্ধুরও। এমন কি ভূতপূর্ব বন্ধুরও। আর নবীনাই বা আমাকে দেখলে কী ভাবত?



কিন্তু তরুণই একদিন, বোধ হয় বিয়ের দিন পাঁচেক পরেই, আমার চেম্বারে এসে হাজির হোলো। বিয়ের দিন এবং তার পরের দিনগুলি দেখা করি নি বলে অনেক অনুযোগ করল। আমি যথাসম্ভব অনৃতভাষণ এড়িয়ে সত্য গোপন করে যুগপৎ ভদ্রতা ও সততা রক্ষা করলুম।

অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলুম, "তারপর? লেজ কাটাবার পরে কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, এতদিন লেজটাকে কী করে বয়ে বেড়িয়েছ?" আমি দৃষ্টি এড়িয়ে হাসতে চেষ্টা করলুম।

তরুণ বললে, "তা মনে হচ্ছে। তবে—"

তবে?

তবে কি তরুণ এখন আমায় এমন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসবে যা ডাক্তার বা বন্ধু হিসাবে আমি উত্তর দিতে পারব না, অথচ উত্তর না দিলেও উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে? আমি একবার ভয়ে ভয়ে তরুণের দিকে তাকিয়ে একটা স্লাইড নিয়ে গভীর মনোযোগসহকারে পরীক্ষা করতে লাগলুম।

একটু হেসে তরুণ বললে, "তবে কি জান—"

"কী?"

"আমাদের দেশের মেয়েরা একেবারে বোকা, একেবারে শিশু। কিচ্ছু জানে না।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে তরুণ আমার একেবারে কাছে এসে কানে কানে বললে, "ডু যু নো, নবীনা ইজ অ্যান আবসল্যুট কিড্। শী ডাজন'ট নো এ থিং অ্যাবাউট দি ফ্যাক্টস অব লাইফ!"

তরুণ অনুচ্চ শব্দে তার কলেজী দিনের তৃপ্ত সরল সলজ্জ হাসি হাসতে থাকল।

## সাঁন মার্কো

কোনো একটা পূজোর ছুটিতে একবার পুরী গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি—কথাটা আজো স্মরণ করলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না—গিয়ে দেখি, আমার সামনে বঙ্গোপসাগর সত্যি শুকিয়ে যায়নি! সত্যি জল আছে এবং কত জল তার শেষ নেই। অপর তীর আছে কি নেই।

কিন্তু এমন সৌভাগ্যপূর্ণ বিস্ময়ের পুনরাবৃত্তি হবার নয়। বেশি হয়ওনি।

মার্চ মাসের বিষণ্ণ একটা বিকালে মিলান স্টেশনে পৌঁছে যখন অ্যামেরিকানদের জন্যে প্রকাশিত একটা ইংরেজি কাগজে দেখলুম যে, বিশ্ববিখ্যাত লা স্কালায় সে সন্ধ্যায় ভার্দির 'ওটেলো' অপেরাটি অভিনীত হবে, তখনই সন্দেহ হোলো যে ওটা মরীচিকা। তবু তৃষ্ণার্তের উপায় নেই সেই মিথ্যা আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার। আমিও পারলুম না। 'বাগাইলিও' লেখা অফিসে আমার একমাত্র স্যুটকেসটি জমা রেখে যাত্রা করলুম লা স্কালা অভিমুখে।

নিঃশব্দে নয়, অশোভন ত্বরার সঙ্গেও নয়, কিন্তু সেই পুরানো অপরিচ্ছন্ন ইটালিয়ান ট্রাম আমাকে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিল ঠিক।

সেখানে পৌঁছে শুনলুম যে, 'অনিবার্য কারণে' সেদিনকার অভিনয় বাতিল করে দেয়া হয়েছে। টিকিটের মূল্য ফেরৎ দেয়া হবে; অন্যথা পরের দিন যে ভার্দি-রচিত 'লা ত্রাভিয়াতা' অভিনীত হবে, দর্শকেরা তার জন্যেও আসন সংগ্রহ করতে পারেন।

আগে ওটেলোর লোভ না দেখালে আমি তাইতেই সানন্দে স্বীকৃত হতুম, কিন্তু এখন আর সে উৎসাহ অবশিষ্ট রইল না। মিলান মলিন হোলো।

সেই নৈরাশ্যে শুধু ভাবছিলুম, স্তাঁদাল কী দেখে এই নগরীর প্রেমে পড়েছিলেন? ফরাসী হয়েও এই মিলানকে স্বদেশের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন?

আমার কিন্তু আর্ট ম্যুজিয়ম দেখবার আর বাসনা ছিল না, মিলানের বিখ্যাত সমাধিক্ষেত্র তো নিশ্চয়ই নয়। আমি পরের ট্রেনে মিলান ছেড়ে ভেনিস গেলুম।

ভেনিসে পৌঁছে আর তার নির্বোধ হতভাগ্য মূয়োরের কথা মনে রইল না। স্টেশন থেকে সোজা জল-বাস্ নিয়ে খাল পার হবার সময়ই চতুর্দিকের আনন্দোচ্ছল পরিবেশে আমার য়ূরোপ-ভ্রমণের সমস্ত নৈরাশ্য কোথায় নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

একটা ভেনিসেরই সৌন্দর্যের সীমা নেই, আর সেই রাত্রে আমি পেলুম দু'টো ভেনিস—একটা স্থলে গড়া, দ্বিতীয়টা জলে আঁকা।

বাড়িগুলি যেন বাড়ি নয়; যেন জলপরী, সদ্য জল থেকে উঠেছে; স্নান সেরে, আবার একটু পরে, তা মিলিয়ে যাবে জলের তলায়।

নৌকাগুলি অলসভাবে ভাসছে জলের উপর, প্রায় ওই বাড়িগুলিরই মতো। সেই গণ্ডোলার আসল উদ্দেশ্য যেন যাত্রীকে 'ক' নামক জায়গা থেকে 'খ' নামক জায়গায় নিয়ে যাওয়া নয়। আসল বিলাস তার জলের আয়নায় আপন ছবি দেখা। গতিটা গৌণ।

নৌকার নির্মাণে তাই কারুকার্য আর প্রসাধনের অন্ত নেই। মাঝি গান

গাইছে নৌকার চিত্রিত প্রান্তে অলসভাবে হেলান দিয়ে। যাত্রী কী করছে? যাত্রিণীকে জিজ্ঞাসা করো। আর যাত্রিণী? যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করো।

কোনো দিকে কারো একটুও তাড়া নেই।

একমাত্র আমার তাড়া ছিল। প্রথমত আমার সঙ্গিনী ছিল না। দ্বিতীয়ত, রেলভ্রমণের ক্লান্তির পরে স্নান না করে আমি যেন আমার চতুর্দিকের আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারছিলুম না।

ভ্রমণকাহিনীকাররা সাধারণত এই বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র করেন না, কিন্তু কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে তা ভালো লাগা বা না লাগা এত সহস্র আপাত-ক্ষুদ্র ঘটনার উপর নির্ভর করে যে, অন্তত এ দু'টি বিষয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে কোনো দেশ সম্বন্ধে কোনো লেখকের মতামত আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনে।

তবু রিভা শিয়াভোলিতে আমার হোটেলে যাবার পথে দূর থেকে সেই একাকী এবং অস্নাত অবস্থায়ও পিয়াৎসা সান মার্কোর যে রূপ পরিদর্শন করলুম তা'তে তৎক্ষণাৎ জল-বাস্ থেকে নেমে পড়ে ওইখানেই থেকে যেতুম, যদি না ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলতুম যে, পরের দু'টো পুরো দিন আমি এই জলপরীর রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ও প্রাণ ভরে উপভোগ করব।

স্তাঁদালের প্রেমভূমি মিলান আমার কাছে মরুভূমি হয়েছিল, কিন্তু বায়রনের এই জলোচ্ছল ভেনিস্‌কে আমি আমার একান্ত আপন করে নিলুম প্রথম দৃষ্টির পরিপূর্ণ প্রেমে।

স্নানান্তে সেই পিয়াৎসা সান মার্কোতে আবার গেলুম। সেখানে ইতিমধ্যে সারা ভেনিস জড়ো হয়েছিল।

নেপোলিয়ন নাকি এখানে পদার্পণ করেই বলে উঠেছিলেন, 'এই পার্কটি তো য়ুরোপের সুন্দরতম ড্রয়িং রুম!' সত্যি সুন্দর, কিন্তু ড্রয়িং রুম বললে

জায়গাটার মুক্ত সৌন্দর্যের অনেকটা যেন অস্বীকার করা হয়। অদূরে জলধারা বয়ে চলেছে। তিন দিক ঘেরা। এক দিকে সান মার্কোর বেসিলিকা, আরেক দিকে পালাৎসো ড্যুকাল, তৃতীয় দিকে সান মার্কোর লিব্রেরিয়া। তাছাড়া আছে বেল টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার, আরো কত কী।

সমস্ত পরিবেশটাই একান্ত অন্তরঙ্গ, তবু যেন কোথাও মুক্তির ছন্দঃপতন ঘটেনি এতটুকু। উন্মুক্ত প্রান্তরের নিঃসঙ্গতা নেই, আবার অন্তরঙ্গ গৃহের বন্ধন নেই। পার্কের একটা ধারে একটা টেবিল নিয়ে বসতে বসতে মনে মনে বললুম, ভেনিস কারো স্ত্রী নয়, সকলের বান্ধবী সে। আমার প্রেমিকা।

এই উপমার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয়নি, কল্পনাশক্তিরও আশ্রয় নিতে হয়নি। পার্কের সর্বত্র অসংখ্য সুন্দরী রমণী প্রাণ ভরে আনন্দ উপভোগ করছিল এবং আদৌ স্বার্থপরভাবে নয়। এই উপভোগের মধ্যে কোথাও এক কণা মলিনতা ছিল না, কেননা কারো আচরণে কোনো প্রকার অপরাধ-বোধের লেশমাত্র আভাস ছিল না।

ভেনিসের মতো জায়গা, এমন একটি সন্ধ্যা ; সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিতে একটি তরুণ আর একটি তরুণীতে যখন দেখা হবে তখন তাদের উচ্ছল প্রাণশক্তি কি ভালোমন্দের প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে পঙ্গু হয়ে থাকবে ? না, হাত বাড়িয়ে ক্ষণিকের মুঠি ভরে নেবে ?

পার্কের একদিকে গীর্জা ছিল, কিন্তু সেই সন্ধ্যায় সমবেত নরনারী হয় তার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেছিল, নয়তো ওরা স্থিরভাবে জেনেছিল যে, জীব-নোপভোগের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই।

পার্কের অন্যদিকে ছিল বিরাট লাইব্রেরী, কিন্তু পুঁথি মিলিয়ে বাঁচবার মতো ক্ষীণপ্রাণ কেউ ছিল না সেখানে।

এক দিকে বাজনা বাজছিল, আর কত জোড়া নরনারী যে তার সঙ্গে নাচছিল তার ঠিক নেই। কেউ কেউ বা একটা নাচ বাদ দিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল, শ্রান্তিহরণের জন্যে স্থলভ মূল্যে কিয়াস্তির অভাব ছিল না।

প্রকৃতি আর মানুষে মিলে সে সন্ধ্যায় শান্ত গ্র্যাণ্ড কেনালের পাশে আনন্দের যে উদ্দাম প্রবাহের অবতারণা করেছিল আমি তাতে সানন্দে ডুব দিলুম। একবারও মনে হয়নি, এমন কিছু করছি যা অনুচিত। অমন পরিবেশে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নটাই যেন একান্ত অবাস্তর। একটা মেৎসো কিয়াস্তির আদেশ দিয়ে আবার চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলুম যে, ভেনিস দেখবার আগে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিইনি।

সামনের গীর্জাকে বললুম আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে, উপরের চাঁদকে বললুম আমার দিকে চেয়ে থাকতে। দু'জনই আমার অনুনয় রক্ষা করেছিল।

কিন্তু, ওই যে গোড়াতেই বলে নিয়েছি, আমি ভাগ্যবান নই। অর্থাৎ দেখা হোলো একটি ভারতীয়ের সঙ্গে। আমি অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারবার আগেই সে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল আমি ভারতীয় কিনা। বলতে চাইছিলুম, না; কিন্তু মিছে কথা বলতে গেলে আমার জিহ্বার যে কী পক্ষাঘাত ঘটে জানিনে, বলতেই হোলো, হ্যাঁ।

বলা বাহুল্য, এর পরে আর নিষ্কৃতি ছিল না। লোকটি শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী। ছাপার কাজ বা অমনি কিছু শিখতে ম্যাঞ্চেস্টারে এসেছিল দু' বছর আগে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, দেশে ফিরবার আগে একবার ইটালি দেখতে এসেছে। ভেনিসের পিয়াৎসা সান মার্কোতে এর চেয়ে অবাঞ্ছিত

সাক্ষাৎকারের কথা আমি আমার কৃষ্ণতম দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতুম না।

তার উপর লোকটি বাচাল। সে আপন মনে বকে যাচ্ছিল; শুধু নিজের সম্বন্ধে নয়, য়ুরোপের নানাবিধ দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তার অচিন্তিত কিন্তু সুনিশ্চিত সব অভিমত। আমি কিছু শুনছিলুম না, কিছুই বলছিলুম না। কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে। একবার লোকটি বলল, "তা আপনি যাই বলুন, এই ইটালিয়ানগুলো সত্যি একেবারে বিলিতি উড়ে।"

বিনয় সরকারের ভাষায়, এই বাঙালী হামবড়ামিটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনে। তবু সবিনয়ে বললুম, "তুলনাটা মন্দ করেননি। প্রাচীন উৎকল স্থাপত্যের ঐশ্বর্য আর ইটালিয়ান স্থাপত্যের বৈভব তুলনীয় বটে। বিলিতি বাঙালী বললে কিন্তু ইটালিয়ানদের বড়োই অন্যায় অপমান করা হোতো।"

লোকটি নির্লজ্জ। আমার রূঢ়তা সত্ত্বেও হেসে বলল, "ও প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিন, মশাই। দেখছেন না চোখের সামনে কী নির্লজ্জের মতো এই ছেলেমেয়েগুলো ধেই ধেই করে নাচছে? ছি ছি! যে জাতির এমন নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে তার আর কোনো আশা নেই।"

অল্পপরিচিত ব্যক্তি বা জাতি সম্বন্ধে এমন উদ্ধত প্রত্যয় যাঁদের জিহ্বাগ্রে, আমি তাঁদের একজন নই। নিজের জীবনে কতবার দেখেছি যে, এমন কাজের জন্যে আমাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে যার পশ্চাতে দুরভিসন্ধি ছিল না। আবার এমনও হয়েছে যে, একান্ত অনভিপ্রেত পরোপকারের জন্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পেয়েছি। আমি তাই আর কোনো লোক সম্বন্ধেই সরাসরি রায় দিতে পারিনে যে ইনি ভালো আর উনি মন্দ। অপরকে বিচার

*করতে এই দ্বিধা আরো সহস্রগুণ বাড়ে যখন কাঠগড়ায় একটা লোক নেই, আছে একটা গোটা জাতি।*

আমি যখন নিঃশব্দে এত কথা ভাবছিলুম তখন নাচের জন্যে যে বাজনাটা হচ্ছিল সেই সুরটা আমার জানা। গানটার প্রথম লাইন ছিল: কিৎসাস্, কিৎসাস্, কিৎসাস্। মূল রচনা বোধ হয় স্প্যানিশ ভাষায়। যাই হোক, গানটা দু'তিন ভাষায় শুনেছিলুম, ইংরেজিতেও। গানে প্রেমিক প্রেমিকাকে ( বা vice versa ) জিজ্ঞাসা করছে, বলছে, 'বলো তুমি আমায় ভালোবাসো কিনা, দুঃসহ সন্দেহের দোলায় আর আমি দুলতে পারিনে!' উত্তরে অপর-পক্ষ শুধু বলে, 'কিৎসাস্, কিৎসাস্, কিৎসাস্!'

সহবাঙালীর দিকে তাকিয়ে মৃদুহাস্যে তার উক্তির উত্তরে বললুম, "ওই গানটা শুনছেন না? পারহ্যাপস, পারহ্যাপস, পারহ্যাপস। তার বেশি জোর দিয়ে আমি কিছু বলতে পারিনে।"

আমি আমার সঙ্গীর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার চেয়ে সুদৃশ্য কাউকে দেখছিলুম।

বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, হয়তো একটু হাসছিলুম। ইতস্তত সঞ্চারিণীদের মধ্যে একজন আমার সেই দৃষ্টিতে বা হাসিতে আমন্ত্রণ পাঠ করে থাকবেন। নিতান্ত সপ্রতিভভাবে একটি মেয়ে আমার টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল উল্টো দিকের শূন্য চেয়ারটা সে অধিকার করলে আমি অসন্তুষ্ট হব কিনা। বলা বাহুল্য, আমি আপত্তি করিনি।

আমি নিজে গিয়ে আজো পর্যন্ত কারো কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারিনি কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ আমাকে তাঁর বন্ধুত্ব ভিক্ষা দিতে চাইলে আমি তাঁকে বিমুখ করেছি এমন নজির নেই আমার জীবনে।

পৃষ্ঠা আট

আমার বিলাতী সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিতে নিতে মেয়েটি বলল, "সিনিয়র কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়ই।"

আমি কোনো সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে একটু অতিকৃত অনুভূতির ইঙ্গিত না দিয়ে কিছু বলতেই পারিনে, বললুম, "সিনিয়রিনা অনুগ্রহ করে আমার একটা সিগারেট না নিলেই বরং ভয়ানক রাগ করব।"

আমার বাঙালী সঙ্গীটি আপন মনে চাপা গলায় বলে যাচ্ছিলেন, "ছি, ছি, লজ্জা বলে কি এদের কিছুই নেই? অনেক নির্লজ্জতা দেখেছি, তাই বলে অচেনা একজন পুরুষেব প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নেয়া?"

আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারতুম। ব্যাখ্যা করতে পারতুম যে, ইটালীতে সিগারেট-শিল্পটা সরকারেব হাতে। এদিকে ডলারের অভাবে ভার্জিনিয়া তামাক আনবার সামর্থ্য নেই, তাই ইটালীর সিগারেট প্রায় অপেয়। তাছাড়া যাকে আমি অকাতরে সিগাবেট দিতে রাজী, তার কাছ থেকে অসংকোচে একটা সিগাবেট নিতে পারব না কেন? ইংরেজের মতো কিছু নেব না, কিছু দেব না, তাহলে বন্ধুত্ব হবে কী করে? কিন্তু এত অর্থনীতি বা সমাজনীতি আলোচনা না করে হেসে বললুম, "আপনিও একটা নিন না। আমি অনেক এনেছি; লণ্ডন থেকে, পরে আবার জেনীভা থেকে।"

নীতিপরায়ণ বাঙালীটি বললেন, "না মশাই, সিগারেট আমি খাইনে।"

আমি বললুম, "তাহলে কামেরিয়েরকে আরেকটা গ্লাস আনতে বলব কি?"

আমি ইংরেজিতে বলছিলুম, কেননা আমাদের সামনে এক বিদেশিনী ছিলেন এবং তিনি বাঙলা জানতেন না। আমার সহ-বাঙালীটির এই সামান্ত

ভদ্রতাটুকুও ছিল না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনার ওয়েটরকে কিছুই বলতে হবে না। আমি এবার যাব, তাহলেই বোধহয় এই সস্তা মেয়েটার সঙ্গে আপনার আলাপ জমাতে সুবিধে হয়!"

আমার মন এমন খুশিতে ভরে ছিল যে, রাগ করবার কথা মনেও এলো না। হাত তুলে শুধু বিদায় জানিয়ে কপট শোকে বললুম, "পার্টিং ইজ সাচ সুইট সরো!"

বাঙালী লোকটি ভীড়ে মিলিয়ে যেতেই মেয়েটি বলল, "কী বলছিলেন আপনার বন্ধু আপনাদের ভাষায়? আমার সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কিছু বলছিলেন নিশ্চয়ই?"

আমি হেসে বললুম, "ও আমাব বন্ধু নয়। এখানেই প্রথম দেখা, এবং আশা করি শেষ।"

মেয়েটি বলল, "আমার সঙ্গে কিন্তু ওর একটু আগে একবাব দেখা হয়েছে!"

আমি কোনোক্রমে গ্লাসটা নামিয়ে বললুম, "তার মানে?"

মেয়েটি বলল, "মানে আবার কী? আমি ওই গীর্জার ধারে ওই দিকটায় দাঁড়িয়েছিলুম, তারপর ও আমায় এসে জিজ্ঞাসা করল যা ওর জিজ্ঞাসা করবার, আর আমি ওকে বললুম যা আমার বলবার!"

"আপনি কী বললেন?" আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না।

"আমি? আমি বললুম—ড্রাপ ডেড্!"

মেয়েটি এমন মুখবিকৃতির সঙ্গে ওই সর্বশেষ মার্কিন বুলি উচ্চারণ করল যে, আমি না হেসে পারলুম না। যদিও ওই দুটি কথার মধ্যে যুদ্ধোত্তর ইটালীর ইতিহাসের বৃহৎ একটা অংশ নিহিত ছিল, যে ইতিহাসটা হাসির

চেয়ে কান্নারই বেশি। বিশদ বিবরণে না গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তাহলে অপর একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আপনার মূল্যবান সময়ের এমন অপচয় করছেন কেন?"

রূঢ়তাশূন্য স্পষ্টতার সঙ্গে মেয়েটি বলল, "আমার সময়ের মূল্য আমি বুঝব। মশায়ের তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। আমি আসছি।"

মেয়েটি উঠে যেতেই তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী আমার চেয়ারের একেবারে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, "ফীলিং লোন্‌লি, হানি?"

এ কোথায় এসেছি? ভেনিসে, না অ্যামেরিকার কোনো শহরে? এরা কেউ ইংরেজি বলে না কেন?

না বলুক, ইংরেজির জন্যে আমার কী দুর্ভাবনা? গোটা ইংরেজ জাতিটাই অ্যামেরিকার মুখ চেয়ে আছে, ভারতবর্ষ তো ইংরেজিকে নির্বাসন-দণ্ড দিয়েই রেখেছে। আমার কোন মাথাব্যথা ওদের ভাষার শুচিতা রক্ষা করবার? মার্কিন উচ্চারণ ইংরেজিকে স্থানচ্যুত করুক। আমি এই মহাদেশে ক্ষণিকের অতিথি। আমি এখানে ফাউলারের প্রতিনিধি নই।

মহিলার প্রশ্নের উত্তরে বললুম, "তা একটু একা বৈকি। একটা সিগারেট?"

বিনা দ্বিধায় মহিলা সিগারেট নিয়ে আমার সামনে বসলেন। বললুম, "একটু কিয়াস্তি? না কি বির্‌রা?"

মহিলা সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "বির্‌রা আমি খাইনে।"

আমি ভাবলুম আমার নিতান্ত অক্ষম ইটালিয়ান উচ্চারণে হাস্যকর

কোনো ভুল হয়ে থাকবে। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল, মহিলা সেজন্যে হাসেননি। বীয়ার খাওয়া বারণ, তার কারণটা কী করে আমায় বোঝাবেন তাই ভেবেই হাসছিলেন। পরে হাসি থামিয়ে হেতুটার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বক্ষে হস্ত স্থাপন করে বলেছিলেন যে, ও বস্তুতে উল্লিখিত প্রত্যঙ্গে মেদবৃদ্ধি ঘটে। ওতে ব্যবসার ক্ষতি।

অন্য যে কোনো কাল বা অন্য যে কোনো স্থান হলে, এমনকি বোধ হয় ওখানেও অন্য কোনো পাত্রী হলে, আমি এমন স্পষ্টভাষিতায় বিব্রত বোধ করতুম। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় আমার জন্মগত নিম্নমধ্যবিত্ত নীতিবোধাতিশয্য কোথায় কী করে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জগতের কাউকে বিচার করবার মতো প্রবৃত্তি ছিল না। মহিলাব বিবৃবা প্রত্যাখ্যানের ব্যাখ্যা তাই নিঃসংকোচে উপভোগ করলুম। বললুম, "তাহলে একবিন্দু কিয়ান্তি?"

মহিলা সানন্দে গ্রহণ কবে বললেন, "গ্রাৎসিয়ে মিল্।" দশ লক্ষ ধন্যবাদ। পুরনো ইটালীয় অমিতব্যয়িতা যাবে কোথায়?

একটা গেলাস আধাআধি খেয়েই মহিলা আবার নানা কথা বলতে লাগলেন। "ভেনিস আর সে ভেনিস নেই। (কোন শহর সেই শহর আছে?)। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জায়গাটায় একটা সমৃদ্ধির সাড়া ছিল, আজ অধিকাংশের দারিদ্র্যের চাপে আবার তা স্তব্ধ। আর সব চোর, এর চেয়ে ভালো আর হবেই বা কী করে? মেয়রের কীর্তিকলাপের কথা কেই বা না জানে? আর চার্চের কথা ভাবতে গেলে তো হেসে বাঁচিনে! গত রবিবার ম্যাস্-এর পরে কনফেশনে গিয়েছিলুম। গ্রীল্-এর ওদিক থেকে পাত্রী দেখছিলুম বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন। পরে বেচারী সরাসরি না বলে আর থাকতে পারল না!"

আমি মেয়েটিকে খুশি করবার জন্যেই বললুম, "পাত্রীকে দোষ দিতে পারিনে।"

মেয়েটি খুশি হয়ে বলল, "সিনিয়র কম্‌প্লিমেণ্ট দিতে বিশেষ পটু দেখছি। তা বাড়িয়ে বলব না, কেউ বলতে পারবে না আমার কাছে এসে নিরাশ হয়েছে।"

এর পরে আর মেয়েটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। যে কারণেই হোক, আমি তখন ঠিক ওই রকমের সঙ্গিনীর সন্ধানে ছিলুম না। তবু সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিল। বললুম, "সিনিয়রিনা এখন যদি আমাকে ছেড়ে চলে যান তাহলেই আমাকে নিরাশ করবেন।"

মহিলা বললেন, "এই খোলা জায়গার চেয়ে বরং অন্য কোথাও চলুন। আমার চেনা এক বুড়ী থাকে কাছেই, আমাদের থাকতে দেবে অল্প ভাড়ায়।"

বাইরে বেড়াতে গিয়ে আমি কার্পণ্যে বিশ্বাস করিনে। তাই আমি যে মহিলার প্রস্তাবে সম্মত হলুম না তার কারণ অর্থনৈতিক নয়।

কিন্তু আমি তো একেবারে মার্কিন হয়ে যাইনি। অর্থের সঙ্গে কোনো একটা অশুচিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে এই সংস্কারটাও মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। তাই, আবার মহিলার কথা এড়িয়ে বললুম, "সে কথা পরে হবে, আপাতত আরেকটা কিয়াস্তি নেয়া যাক। কিয়াস্তি আপনি অপছন্দ করেন না নিশ্চয়ই।"

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে মহিলা আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর যোগ করলেন, "সিনিয়র এখনো মূল্যের কথা কিন্তু উল্লেখও করেননি।"

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো সুন্দরী রমণী আমাকে তাঁর সান্নিধ্য দিয়ে ধন্য করবেন, এমন দুরাশা বহুদিন পূর্বেই বর্জন করেছি। তবু এই নগ্ন আলোচনাটা ভালো লাগছিল না।

মহিলার প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে বললুম, "সমরসেট ম'মের নাম জানেন?"

"জানি।"

"তিনি বলেছেন, যে মেয়েকে ভালোবাসিনে তার মূল্য কখনোই পাঁচ টাকার বেশি নয়, যাকে ভালোবাসি তার মূল্য আমার সর্বস্ব।"

"সুন্দর কথা। বাট লেট'স্ কীপ লাভ্ আউট অব ইট।"

"অ্যাণ্ড লাভ্-মেকিং টু। তার চেয়ে আসুন, দুজনে বসে কিঞ্চিৎ কিয়ান্তি শেষ করে গণ্ডোলায় বেড়াই।"

সহসা মহিলা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন, দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললেন, "ভেনিসের কোনো মেয়ে এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারতো? কিন্তু অমন বিলাস আমার সামর্থ্যের অতীত।"

আমি বললুম যে সেজন্যে তাঁকে ভাবতে হবে না। আমার আপত্তি শুধু ছিল নগদ মূল্যে সঙ্গক্রয়ে। মহিলা চুপ করে রইলেন। আমি ভাবছিলুম কিছুক্ষণ আগেকার আমার সহ-বাঙালীর মন্তব্যগুলি। সত্যি কী যেন হয়েছে কন্টিনেন্টের মেয়েদের। এমন নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নুতা কবে থেকে ওদের পেয়ে বসল? আর কেনই বা? অ্যামেরিকান জি আই বাহিনীর সংক্রমণকে দোষ দেয়া সোজা কিন্তু সেইটেই কি পুরো ব্যাখ্যা? প্রেম ক্রয়বিক্রয়ের পণ্য পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু ইটালিয়ান সমাজের প্রায় প্রত্যেক স্তরে তার এমন ব্যাপক প্রসার ঘটল কী করে?

আমার চিন্তার ভয়াবহতা আরো বীভৎস হয়ে উঠল যখন মহিলা অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, "পাঁচ হাজার লিরা।"

দামটা সত্যি খুব বেশি নয়। তখনকার হিসাবে গোটা চল্লিশ টাকা। কিন্তু আমার আপত্তি তো তাই নিয়ে নয়।

তাঁর মতো স্পষ্ট ভাষায় কী করে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে হয় ভেবে না পেয়ে আমি চারদিকে তাকালুম।

অদূরে আমার পূর্বতন সঙ্গিনীকে আড়াল করে বাঙালী ভদ্রলোক পিয়াৎসা থেকে বেরিয়ে খালের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন দৃশ্য দেখে হাস্য সম্বরণ করা শক্ত। আমি সত্যি হেসে উঠলুম। কিয়াস্তিজনিত তরল দার্শনিকতার সঙ্গে ভাবলুম, কে কাকে বিচার করবে?

অসতীর গায়ে কে প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপ করবে?

সবাই বাস করি কাঁচের ঘরে, কে কার দিকে ঢিল ছুঁড়বে?

তাড়াতাড়ি হাসি থামিয়ে সঙ্গিনীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলুম। বললুম, "আমার হাসিতে অপরাধ নেবেন না যেন। আজ সন্ধ্যাটা এমন প্রাণ ভরে খুশী রয়েছি যে যা কিছু দেখছি তাই ভালো লাগছে। আসুন, আমার এই আনন্দে যোগ দিন। দামের কথা তুলবেন না। এমনিতেই ইটালীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।"

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। যাবার আগে আমার প্যাকেট থেকে আরো একটা সিগারেট নিয়ে বললেন, "সিগারেট আর কিয়াস্তির জন্যে ধন্যবাদ।"

সিগারেট ধরিয়ে এক পা বাড়িয়ে হাত তুলে বিদায় নিতে বললেন, "চাও চাও।"

আমি পকেট থেকে হাজার দুয়েক লিরা বের করে দেবার আগে বললুম, "সত্যি যাবেন? সত্যি আপনার গণ্ডোলায় বেড়াবার ইচ্ছা নেই?"

"হ্যাঁ যাব। বললুম তো, বিলাসে আমার লোভ আছে, কিন্তু অধিকার নেই।"

একটু থেমে নিরশ্রু করুণ কণ্ঠে যোগ করলেন, "আমার ঘরে একটি শিশু আছে। চার বছর। সে তার মাকে আর সব কিছুর জন্যে ক্ষমা করবে, কিন্তু অবৈতনিক বিলাসিনী হলে ক্ষমা করবে না। তবু আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বুয়োনে সেরা।"

মহিলা আবার যেতে উদ্যত হলেন। আমি বললুম, "আপনার সময় নষ্ট করেছি বলে ক্ষমা করবেন। যাবার আগে এই দু' হাজার লিরা নিলে অনুগৃহীত হব।"

হেসে মহিলা বললেন, "সিনিয়র ইজ টু টু কাইণ্ড। কিন্তু আমার শিশু তার মা ভিখারিণী হলেও ক্ষমা করবে না। আপনার জন্যে কিছু তো করিনি, ওটা নিতে পারব না। তবু ধন্যবাদ। এবার আমি যাবই। রাত বাড়ছে, গ্রাহক কমছে। ছাও ছাও।"

মহিলা যেমন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি শূন্যে অন্তর্হিত হলেন। পড়ে রইলুম আমি। চতুর্দিকের কোলাহল এতক্ষণ কানেও আসেনি, এখন সেই হৈ হৈ নাচ আর হাসি আর বাজনা কেমন যেন বেসুরো শোনাল।

আমি শরৎবাবু পড়েছি, সদ্যোবর্ণিত ঘটনায় আমার হৃদয় তাই মথিত হবার কথা নয়। কিন্তু পিয়াৎসা সান মার্কোর চেহারা আমার কাছে নিমেষে যেন বদলে গেল। নির্দোষ উপভোগের যে বহিঃপ্রকাশ একটু আগে আমাকে

মুগ্ধ করেছিল, এখন সেই একই পরিবেশ একেবারে বিভিন্ন মনে হোলো। মন থেকে এই চিন্তাটা কিছুতেই দূর করে দিতে পারলুম না যে বাইরের এই আনন্দ-কোলাহলের তলায় কত শিশু কাঁদছে, কত মা সেই কান্না থামাবার জন্যে নিজেদের কান্না চেপে আমার আর তোমার কাছে এসে হাসছে, 'ভালোবাসছে'।

কিন্তু আমি বিংশ শতাব্দীর পর্যটক। হোক সেগুলির ফল মর্মান্তিকরূপে সাময়িক, দুঃখনিমজ্জনের নানা কৌশল আমার জানা। আমার যে অংশটা অপরের দুঃখে অনর্থক অশ্রুবিসর্জন না করে পারে না, শুধু আমার নিজের উপভোগের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়, পরের ভালো না করে নিজের ক্ষতি করে, সেই আপদ বিদায় করবার জন্যেই আবার কামেরিয়েরকে স্মরণ করলুম।

বললুম, "আরো একটা কিয়ান্তি।"

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ আমাব টেবিলের পেছন থেকে একটি একান্ত অপরিচিত ব্যক্তি বলে উঠল, "না, না, কিয়ান্তি নয়। লা গ্রিমি ক্রিস্টি!"

আমি বিরক্তি বা বিস্ময় কিছুই গোপন না করে বললুম, "বা রে, আমি তো আপনার জন্যে অর্ডার দিচ্ছিনে। আমার কিয়ান্তি চাই।"

বিদূষকের মতো হো হো করে হেসে লোকটি ওয়েটরকে তাড়াতাড়ি ওদের ভাষায় কী বলল ওরা দুজনই জানে। আমি শুধু দেখলুম যে ওয়েটর আর একবারও আমার দিকে না তাকিয়ে চলে গেল। আর আমার স্বনিযুক্ত উপদেষ্টা একটা চেয়ার টেনে ঠিক আমার সামনে এসে বসল। অনুমতি চাইবার প্রয়োজন নেই, আমার সম্মতির অপেক্ষা নেই।

লোকটি বলল, "যস্মিন দেশে যদাচার। যখন রোমে তখন রোমানদের মতো, আর যখন—"

এই প্রবাদবন্যা রোধ করবার জন্যেই আমি বললুম, "আর যখন ভেনিৎ-সিয়ায় তখন ভেনিসিয়ানদের মতো আচরণ করবে। তাই না?"

পুলকিত আগন্তুক বললেন, "ঠিক তাই।"

এমনিতেই সেই সন্ধ্যাটায় যা খুশি তাই ঘটছিল। কোনো যুক্তিসম্মত পারম্পর্য ছিল না এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার, এক পরিচিতির সঙ্গে দ্বিতীয় পরিচিতির। আমারও সেই সন্ধ্যায় সঙ্গতি রক্ষার শক্তি বোধহয় লোপ পেয়েছিল। আমি তখন সবজেক্ট ছিলুম না, অবজেক্ট ছিলুম। আমি নিজে কিছু করছিলুম না, নিষ্ক্রিয় আমার উপর শুধু একটার পর একটা ঘটনা ঘটছিল।

বিলাসিনী যদি, বিদূষক নয় কেন? আমি তাই আমার প্রথম অশ্রদ্ধা পরিহার করে বললুম, "আসুন, বসুন; সত্যি, ইটালিয়ানদের মতো অযাচিত বন্ধুত্ব কেউ দিতে জানে না।"

আমার আমন্ত্রণ সত্যি পুরোপুরি আন্তরিক ছিল না; ভদ্রলোক বিনা দ্বিধায় আমার অনুক্ত শ্লেষ উপেক্ষা করে হেসে কিন্তু একটু অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন, "সিনিয়র মিথ্যা বলেন নি। যার যা নেই, যে যা পায় না, তা সে সর্বদাই মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দেয়। বাইবেল না কোথায় যেন এই রকমেরই একটা কথা আছে। যার আছে তাকে আরো দেয়া হবে, যার নেই তারই কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। আমারও—"

আমি ভাবছিলুম এর পরেই হবে নিউকাসল আর কয়লার কথা। এমন কি, আমার বরাত আরো মন্দ হলে, তেল আর তৈলাক্ত শিরের কথাও

হয়তো। আমি যে সাধারণত অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেচে আলাপ করিনে তার আসল কারণ এই অভিজ্ঞতা-প্রসূত আশংকা যে বেশির ভাগ লোকের সংলাপ-প্রতিভার সর্বস্ব ওই গুটিকয় প্রবাদে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আমার অনামন্ত্রিত বন্ধুর আকৃতি যতই বিদূষকের মতো হাস্যকর হোক, তার কথাগুলি কিছুতেই শুধু কণ্ঠোদ্ভূত বলে মনে হচ্ছিল না। বেশির ভাগ কথাই যেন কোনো বাটি আর কাঠির সংঘর্ষের শব্দ; এমন দু চারজন লোক আছেন যাঁদের কথা শুনলেই মনে হয় যে তাঁদের বাটিতে জল আছে, তাঁদের কথা তাই জলতরঙ্গের ধ্বনি। আমার নবলব্ধ বন্ধুর কথা শুধু ল্যারিংক্স থেকে আসছিল না, তার উৎস ছিল আরো গভীরে। তাই এবারে তাঁর কথা শোনবার জন্যেই বললুম, "কিয়াস্তির বদলে ওটা কী বস্তু চাইলেন আমার জন্যে? আমি সন্ধ্যা থেকে কিয়াস্তি খাচ্ছি, মেশাতে চাইনে।"

সশব্দে হেসে বন্ধু বললেন, "কোনো ভয় নেই আপনার। আমি যা চেয়েছি তা একই জাতের। নামটার মানে, দি টিয়ারস অব ক্রাইস্ট, যীশুর অশ্রু! লা গ্রিমি ক্রিস্টি!"

বারকয় ওই নামটা উচ্চারণ করতে করতে লোকটির চোখ দিয়ে সত্যি জল ঝরতে থাকল। লোভ হলে তো রসনা সিক্ত হবার কথা। আমার বন্ধুর চোখে জল কেন? তবে কি সত্যি যীশুরই কথায় চোখে জল?

এই ল্যাটিনদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সমান আন্তরিকতার সঙ্গে ওরা প্রায় একই সময়ে আনন্দে উদ্দাম ও ভক্তিতে উদ্বেল হতে পারে। বাইরের লোক যখন দুটোকে বিসদৃশ মনে করে একটাকে আন্তরিক বলে উপহাস করে আর অপরটিকে অভিনয় বলে অবিশ্বাস করে, তখন ল্যাটিন

লোকেরা বুঝতে পারে না দু'য়ে বিরোধ কোথায়! অবাক হয় বিদেশীর নির্বুদ্ধিতায়।

আমি বিব্রত হয়ে তবু বললুম, "আহা, কাঁদছেন কেন?"

একটু ভেবে জিজ্ঞাসার সঙ্গে একটু তত্ত্বকথা যোগ করলুম, "যীশুই কি আমাদের সকল পাপের জন্যে কাঁদেননি? তা—তা—তার পরে আর আমাদের কান্নার প্রয়োজন কী?"

আমার দেয়া সান্ত্বনা আমার বন্ধুকে স্পর্শ মাত্র করল না। তিনি শুধু আপন মনে বলে চললেন, "আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অদ্ভুত একটা বিদূষক বলে মনে করছেন। তা মিথ্যা মনে—"

আমি একটু আগে ঠিক তাই মনে করেছিলুম। তাই তাড়াতাড়ি তাঁর কথা থামিয়ে প্রতিবাদ জানাতে হোলো। বললুম, "না, না, তা মনে করব কেন? হাস্যকর কোনো কিছু আপনি—"

কে কার কথা শোনে! আমার বন্ধু আবার সরবে কেঁদে উঠে বললেন, "হায়রে, আলবের্তো মেনোত্তির কি আর সেই সৌভাগ্য হবে যে ভেনিৎসিয়ার অতিথি তাকে বিদূষকে বলে মনে করবে! আমার কপালই এমন যে—"

আমি আবার বিব্রত হয়ে আমার বন্ধুর কান্না থামতে চেষ্টা করলুম। তাঁকে ব্যথা না দেবার উদ্দেশ্যেই সত্য গোপন করেছিলুম, বলেছিলুম তাঁকে বিদূষক বলে মনে করিনি। এখন কী বলব ভেবে না পেয়ে বললুম, "বেশ, আপনি যদি তাইতেই খুশী হন তাহলে আপনাকে বিদূষক বলেই মনে করেছি।"

কিন্তু সিনিয়র মেনোত্তি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। বলে চললেন, "না, না, এখন আমাকে সান্ত্বনা দিলে কী হবে? আমি জানি আপনি আমায় কী ভাবছেন।"

আমার নিজেরই জানতে চাইতে হোলো, "কী ?"

মেনোত্তি কান্না না থামিয়েই বললেন, "পিছন থেকে আপনাকে দেখেছি দুটি মহিলাকে ফিরিয়ে দিতে। তার পরেই আমি এসেছি। আমাকে নিশ্চয়ই আপনি নাছোড়বান্দা পিম্প্ বলে মনে করেছেন।"

সত্যি তা মনে করিনি। কিন্তু আমি আমার প্রতিবাদ জানাতে পারবার আগেই মেনোত্তি আরো ক্ষুব্ধ কণ্ঠে যোগ করলেন, "হয়তো পিম্পও মনে করেননি। তার চেয়েও জঘন্য কিছু মনে করেছেন।"

ততক্ষণে আমি মস্তের প্রগলভ আত্মধিক্কারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা থেকে বিরত হয়েছিলুম। শুধু হেসে বললুম, "তাই নাকি? কী বলুন তো ?"

মেনোত্তির কথা আর শুনতে পাবার আগেই আবার বাজনা শুরু হোলো। সেই সঙ্গে নাচ। আমি তাই দেখছিলুম আর দর্শকবিস্মৃত আনন্দোচ্ছল শতাধিক তরুণ-তরুণীর জীবনোপভোগে অংশ নিতে চেষ্টা করছিলুম। মেনোত্তিও মৌন থেকে পানে মন দিয়েছিল, যদিও তারও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নর্তকনর্তকীদের উপর।

কিন্তু তবু একটু প্রভেদ ছিল। আমার দৃষ্টি ছিল ছড়ানো, আমি একবার এদিকে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখছিলুম, পর মুহূর্তেই একেবারে ওদিকে তার চেয়েও সুন্দরী কোনো মেয়ের প্রতি দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল ; কিন্তু মেনোত্তি যেন স্থির দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করছিল। যেন আর কেউ আছে কি নেই সেদিকে তার দৃষ্টিই ছিল না।

একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে পুরনো সেই আত্মধিক্কারের স্বরে বলল, "আমাকে বিদূষক ভেবেছ, না ? ঠিকই ভেবেছ।"

হঠাৎ একেবারে অন্যরকম কণ্ঠস্বরে অট্টহাস্যসহকারে মেনোত্তি বলল, "এই দেখো আমি সত্যি বিদূষক। এই দেখো—"

মেনোত্তি আস্তে তার গোঁফজোড়া নাকের তলা থেকে সরিয়ে বলল, "এই দেখো। আমি সত্যি অত বুড়ো নই। কাঁচাপাকা গোঁফ পরেছি আত্ম-গোপন করতে। একবারও বুঝতে পারোনি, তাই নয়? আমি এক সময়ে থিয়েটারে কাজ করতুম যে। রূপসজ্জার নানা কৌশল আমার নখাগ্রে। তা তুমি তো আমায় আগে কখনো দেখোনি, যারা বহুদিন দেখেছে—এবং বহু রাত্রি—খুব কাছে থেকে—তার চেয়ে কাছে হওয়া সম্ভবই নয়—তারাও যাতে না চিনতে পারে সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা করেছি।"

মেনোত্তি আবার তার নকল গোঁফ আসল নাকের (আসল নাক তো?) তলায় স্থাপন করে আমার দিকে চেয়ে সজোরে হাসতে থাকল। আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। অর্ধপরিচিত এই আগন্তুকের উদ্দেশ্য কী? এই ছেলেমানুষী ম্যাজিকের দর্শক হিসাবে লোকটা শেষ পর্যন্ত আমাকেই নির্বাচন করল কেন? আরো তো কত লোক ছিল ওই পিযাৎসা সান মার্কোয? অজানা অশান্তিতে আমার না ছিল হাসবার শক্তি, না কিছু বলবার। মেনোত্তির নিজেরও বোধ হয় আমার নির্বাক বিহ্বলতায় করুণা হোলো। হাসি থামিয়ে সে বলল, "কী জানো, আমি বিদূষকও নই, পিম্পও নই, ঠগ্‌জোচ্চোরও নই। আমি—আমি—আমি—"

মেনোত্তির দ্বিধা সত্ত্বেও আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না, "কী?"

মেনোত্তির কণ্ঠস্বরে আবার একেবারে আমূল পরিবর্তন ঘটল। এবারে সে হাসাবে না, কাঁদাবে না, ভয় পাওয়াবে না। শুধু স্বগতোক্তির মতো

কয়েকটা কথা বলে যাবে, কে শুনল বা না শুনল বয়ে গেল। আর আমি তো বিদেশী। বিদেশীব কাছে কিছু বলা যেন গোপনীয় কোনো চিঠি নাম-ঠিকানা না লিখে শহবের বাইবেব কোনো ডাকবাক্সে ফেলে দেয়া—লেখাও হোলো, অথচ কাউকে জানানো হোলো না। অন্তত এমন কাউকে নয় যে বুঝবে কাব কথা বলা হচ্ছে। কিম্বা যেন কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প লেখা, লোক আর জায়গাব নাম বদলে দিয়ে; বুকের বোঝা নামল কিন্তু কাউকে বিব্রত কবা হোলো না, বেননা কেউ জানবে না কার কথা লেখা হয়েছে। মেনোত্তি যেন আমাকে অনেকটা সেইভাবেই ব্যবহাব কবছিল! যেমন ক্যাথলিকবা শুনেছি কখনো কখনো ভিন্ দেশে গিয়ে পবভাষায পুরুতেব কাছে কনফেস্ কবে লজ্জা এড়ায়।

মেনোত্তি তেমনি বলল, "না, আমি ওসব কিছু নই। আমি শুধু গৃহহীন গৃহী, স্ত্রীবিহীন স্বামী, পাথাহীন পাখী!"

ইটালিয়ানদেব গলায এই ব্যর্থপ্রেমেব করুণ স্বর যে কী মর্মন্তুদ শোনাতে পারে আগে জানতুম না। আমি ভেনিসে এসেছিলুম আনন্দেব সন্ধানে, পিযাৎসা সান মার্কোয় প্রথমে কিয়াস্তি ও পবে লা ক্রিমি ক্রিস্টি নিয়ে বসেছিলুম ওই একই অনসৎ উদ্দেশ্যে। কিন্তু একটাব পব একটা বিবতি ঘটতেই থাকল। শুধু, এর আগেব বিরতিগুলি বিরতি বলে মনে হয়েছিল, মেনোত্তিব করুণোক্তি হৃদয় স্পর্শ কবল। আমি নাচ থেকে চোখ ও বাজনা থেকে কান সরিয়ে নিয়ে স্ত্রীবিহীন স্বামীব কথায় মন দিলুম।

মেনোত্তি বলল, "ওই দূরে, একেবাবে ডান দিকে, ওই ফিকে নীল ফ্রক পবা মেয়েটিকে দেখছেন? ওই যে, এবারে যে ঘুবল, ওই যে নীল লাউঞ্জ

স্যুট পরা লোকটির সঙ্গে যে নাচছে। দেখেছেন? বুঝতে পেরেছেন কার কথা বলছি?"

আমি ওই মেয়েটিকে এর আগেও লক্ষ্য করেছিলুম। অমন সৌন্দর্য ভেনিসেও দুর্লভ। নাচেও তেমনি চমৎকার। তার রূপে ঔজ্জ্বল্যের অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল অনির্বচনীয় কোমলতা, যা যুবতীর দেহে প্রতিফলিত হয় শুধু তখনই যখন তার নির্দোষ চিত্তে আবিল অভিজ্ঞতা স্থান পায়নি। কবুল করতে লজ্জা নেই, মেয়েটিকে দূরে থেকে দেখেও আমার বড়ো ভালো লেগেছিল।

মেনোত্তি বলল, "সুন্দরী, তাই নয়?"

মেনোত্তির কণ্ঠে রূপসুধাপানের আনন্দের লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না, কিন্তু আমি তা উপেক্ষা করে তার প্রশ্নের অনুক্ত উত্তরে সর্বান্তঃকরণ সম্মতি জানিয়ে বললুম, "অপরূপ!"

আমি আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলুম। হঠাৎ মেনোত্তি দর্পারিক্ত করুণ কণ্ঠে ঘোষণা করল, "ও আদ্রিয়ানা। আমার স্ত্রী!"

আমি সেই সন্ধ্যায় পৃথিবীর প্রায় সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম, কিন্তু মেনোত্তির এই উক্তিটি আমায় আঘাত করল প্রায় নীলাকাশে বজ্রপাতের মতো। হতবাক্ আমি তখন যা বলতে পারলুম তা শুধু, "সত্যি?" সত্যি আমার অবিশ্বাস তখনো ঘোচেনি।

মেনোত্তি বলল, "সত্যি। অর্থাৎ কাল পর্যন্ত তাই সত্য ছিল।"

আমার তবু বলতে হোলো, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ কিছু দিন আগে থেকেই আমি সন্দেহ করেছিলুম- যে আদ্রিয়ানা আমার প্রতি উদাসীন। কেন বলতে পারব না, বাইরের কোনো লোককে

তা বোঝানো অসম্ভব। স্বামী-স্ত্রীর নানা নিবিড় অন্তরঙ্গতায় কোনো এক পক্ষের কোথাও এতটুকু ব্যত্যয় ঘটলে অপর পক্ষ তা সহজেই বুঝতে পারে, যদিও বাইরের লোকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সহজেই, এমনকি বলে দিলেও নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলে মনে হয়। স্বামীর কাছে যা হৃদয়বিদারক ঔদাসীন্য, বাইরের লোকের কাছে তা নিতান্ত ক্ষমণীয় অসতর্কতা মাত্র। আমার দুর্ভাগ্য, বর্তমান ক্ষেত্রে আমি স্বামী।”

বাইরের লোকের পক্ষে সান্ত্বনা দেয়াও অত্যন্ত সহজ। দার্শনিক বাগ্‌-বিস্তারের তো কথাই নেই। তাই আমি সহজেই বললুম, “অমন কথা বলবেন না, সিনিয়র মেনোত্তি। আজই শুধু এই সম্পর্কটা অবিমিশ্র অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে। একদিন একেই স্বর্গের সুখের চেয়েও রমণীয় মনে হয়েছিল —তাই নয়?—এবং তারও উৎস ছিলেন সিনিয়রা মেনোত্তি। সেটা অস্বীকার করা নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞতা হবে।”

“আমি সেটা আদৌ অস্বীকার করিনে, সিনিয়র। অস্বীকার করতে পারলে তো ভালো হোতো, বর্তমান যন্ত্রণা থেকে তাহলে কিয়দংশে নিষ্কৃতি পেতুম। কিন্তু পুরনো দিনের সেই সুখস্মৃতিই তো বর্তমানকে এমন অসহনীয় করে তুলেছে। যদি জানতুম যে আদ্রিয়ানা কখনোই আমায় ভালোবাসেনি তাহলে তাইতে হয়তো অভ্যস্ত হয়ে যেতুম, হয়তো ওকে বিয়েই করতুম না। কিন্তু আমাদের বিবাহিত জীবনের পাঁচ বছরের সঙ্গে তুলনা করেই তো বর্তমানটাকে এমন নিঃস্ব মনে হয়। নির্বিবাদে আদ্রিয়ানার এই ঔদাসীন্য মেনে নিতে পারিনি বলেই তো আজ এমন অবস্থায় পড়েছি যে আজ আমি আপনার কাছে—না কি এতক্ষণ ‘তুমি’ বলছিলুম?—বিদূষক থেকে অভিন্ন হয়ে গেছি। আর আপনাকেই বা দোষ দেয়া কেন? আমার

নিজেরই নিজেকে অনেক সময় বিদূষক বলে মনে হয়। মনে হয় সবাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আপনিও হাস্থন। দোষ দেব না।”

আমি সত্যি হাসছিলুম না। বললুম সেকথা।

“সত্যি হাসছেন না? তাহলে বলি আপনাকে। ওই নীল ফ্রকটা দেখছেন না? ওটা আমার দু’ চক্ষের বিষ। ওটা ওর বোনের দেয়া। ওটা প’রে বোনের বাড়ি থেকে আসতেই আমি বললুম, ‘নীল রঙ্ আমি দু’ চোখে দেখতে পারিনে। এই বিশ্রী ফ্রকটা কিনতে গেলে কোন দুঃখে?’ আমি ভেবেছিলুম ওই ফ্রকটা ও কিনে এনেছে।”

নীল আমার রক্তের রঙ্ নয়, কিন্তু মনের রঙ্। বললুম, “আমি কিন্তু নীল খুব ভালোবাসি।”

“আমি বাসিনে। মনে আছে, আমাদের বিয়ের দিন পনের পরে আদ্রিয়ানা একটা নীল ফুলদানি এনেছিল আমাদের শোবার ঘরের জন্যে। আমি যেই বললুম নীল আমার অপছন্দ, অমনি আদ্রিয়ানা ওটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল আমার বাড়ির পিছনের খালের জলে। আমি তো অবাক্। বললুম, ‘আহা, ছুঁড়ে ফেলে দেবার কী দরকার ছিল?’ মনে আছে, আদ্রিয়ানা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ‘মিনো আমার, যেদিন আমাকে তোমার ভালো লাগবে না সেদিন যেন ঠিক এমনি-ভাবে বিনা দ্বিধায় দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা না করে নিজেকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি।’ হায় রে—”

আমি একটু স্থযোগ পেয়ে বললুম, “এমনই বা ক’জনের ভাগ্যে ঘটেছে? আজ কি সেই কথা মনে করেই—?”

মেনোত্তি বলল, “সেই কথা মনে করেই তো আজ এত বেশি বেদনা

পাই। সেদিন যখন আদ্রিয়ানা নীল ফ্রক্ পরে এলো আর আমি বললুম যে ওটা আমার পছন্দ নয়, তৎক্ষণাৎ আদ্রিয়ানা আমায় জানিয়ে দিল যে, ওই নীল ফ্রক্‌টা তার বোনের দেয়া, যে ওটা আমার অপছন্দ হলেও কিছু এসে যায় না, কেননা 'অন্যান্য অনেকের ওই নীল ফ্রকটাই পছন্দ। যেমন ওই—'

"আমি তখনও সব কিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না। বললুম, 'যেমন ?'

"আদ্রিয়ানা এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল কি করল না, বলল, 'যেমন ?—যেমন বাড়ি ফিরবার আগে চুল শ্যাম্পু করতে গিয়েছিলুম সেবাস্তিয়ানোর দোকানে। ও তো আমাকে দেখেই পাগল ; বলে, এমন সুন্দর পোষাকে আমাকে দেখেনি কখনো এর আগে।' আদ্রিয়ানা তার দু'হাত দিয়ে ওই নীল ফ্রক্‌টার দুটো প্রান্ত ঈষৎ তুলে ধরে একবার ঘরের এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াল—যেন ফ্যাশন মডেল, যেন মাটিতে পা পড়ে না।

"বয়সে আমার চেয়ে আদ্রিয়ানা বেশ ছোটো। অনেকবার মনে হয়েছে যে কোনো দিন হয়তো ও আমার কোনো ছাত্রের সঙ্গে প্রেম করবে—হ্যাঁ আমি ইস্কুল মাস্টার—কিন্তু সেবাস্তিয়ানো ? কী জানি, কী জানি—!"

মেনোত্তি সত্যি মাথা নীচু করে নিজের মনে কী যেন ভাবতে থাকল। কোথায় যেন কী হিসাবে ভুল হয়ে গেছে। অন্য কোনো মাস্টারের সঙ্গে প্রেম ; হ্যাঁ, মেনোত্তি সেটা বুঝতে পারে। এমনকি কোনো ছাত্রের সঙ্গে প্রেমও তার কল্পনাতীত নয়। কিন্তু তাই বলে সেবাস্তিয়ানো, ওই বড়ো খালের ওপারে স্টেশনের কাছে ওই নাপিতটা, ওর সঙ্গে ? মেনোত্তির দুঃখ

যেন শুধু আদ্রিয়ানাকে হারিয়ে নয়, আরো বৃহৎ কোনো অপমান যেন লেগেছে ওর গায়ে।

আমি তাই বললুম, "আসলে আদ্রিয়ানাকে হারিয়ে আপনি অভিভূত হননি। আপনার শোকের মূল আসলে প্রেম নয়, আপনার দুঃখ শুধু এই যে আদ্রিয়ানা বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে না গিয়ে সেবাস্তিয়ানো—"

আমি ওই নরসুন্দরের নাম জানতুম না। তাই আমায় থামতে হোলো। মেনোত্তি আমার বাক্য শেষ করে বলল, "ওর নাম সেবাস্তিয়ানো পণ্টেকর্ভো। নামের বাহারের শেষ নেই। বলে, ওর পেশা চুল কাটা; আসলে ওর ব্যবসা গলা কাটা। দোকান ওই বাজারের মধ্যে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের জোরে দাম আদায় করে পাওনার দশ গুণ। লেডোয় লোকটার একটা ব্রাঞ্চ আছে। সেখানে দর নাকি আরো বেশি। অবিশ্যি, ইটালিয়ান কেউ অত দাম দেয় না, ওসব ফাঁকি চলে শুধু টুরিস্টদের উপর। ওই বাইরে থেকে আসা বোকা অ্যামেরিকানগুলো—ওরা এই গোটা য়ুরোপটাকে প্রকাণ্ড একটা গণিকালয় করে তুলেছে।"

এই মনোভাবের সঙ্গেও আমি অপরিচিত ছিলুম না। য়ুরোপের নানা রাজধানীতে এই একই অভিযোগ শুনেছি নানা মুখে। কখনো কখনো এমন সন্দেহও হয়েছে যে এই মার্কিনবিদ্বেষেব পশ্চাতে সত্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বোধহয় অনেকটা ঈর্ষাও সেই সঙ্গে মেশানো আছে। অ্যামেরিকানদের অনেক দোষ নিশ্চয়ই আছে—কার নেই?—কিন্তু ওদের যে অপরাধটা আমরা একেবারেই ক্ষমা করতে পারিনে তা হচ্ছে এই যে যা আমরা কিনতে পারিনে সামর্থ্য নেই বলে, তা ওরা অনায়াসে কেনে, কিনে ফেলে দেয়। শুধু তাই নয়, ওদের উন্মত্ত অপব্যয়িতায় শুধু দোকানের এটা বা ওটার দাম

বাড়ে না, মানুষের মনের সকল স্নিগ্ধ অনুভূতির মূল্য যেন ঠিক সেই পরিমাণেই কমে যায়। মানুষে-মানুষে যে সব সম্বন্ধে আগে টাকার প্রশ্নটা অবান্তর বা গৌণ ছিল, ওরা এলে নিমেষে যেন সেই প্রশ্নটাই একমাত্র বিবেচ্য হয়ে ওঠে। নিঃস্ব ভারতীয় হয়ে রিক্ত ইটালীয়ের এই অভিযোগটাকে একান্ত ঈর্ষাপ্রসূত বলে আমিই বা কী করে তুচ্ছ করব ?

তবু সে সব প্রশ্ন না তুলে বললুম, "একটা সামান্য ফ্রক্ নিয়ে এত কাণ্ড না করলেও পারতেন।"

মেনোত্তি বলল, "হায়রে, তাই তো একটু আগে বলছিলুম যে বাইরের লোকের কাছে এসব সামান্যই মনে হবে! কিন্তু ফ্রক্‌টা তো আসল প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন কি সেই নীল ফুলদানিটাই ছিল ? তবু সেদিন যখন আদ্রিয়ানা জানল যে নীলে আমার অপছন্দ তখন তো তার এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়নি ওই বস্তুটা পরম বিতৃষ্ণাভরে ছুঁড়ে ফেলতে! সেদিন বস্তুর প্রশ্নটা অবান্তর ছিল, আমি সে সম্বন্ধে কী ভাবি সেইটেই ছিল একমাত্র বিবেচ্য। আজ আদ্রিয়ানার মন জুড়ে আছে কোথাকার কে নাপিত কী বলেছে প্রশংসা করে, সেই কথা। আমার মতের মূল্য কী ? আমি পোষাকের ফ্যাশনের কী জানি ? বুঝলেন ভারতীয় বন্ধু, একটা যুগের প্রভেদ এই দুই মনোভাবের মধ্যে। স্পেশ্যালিস্ট জায়গা জুড়ে বসেছে হিউম্যানিস্টের।"

চিরন্তন, অন্তত পুরাতন, ত্রিকোণের ব্যাখ্যায় এত দার্শনিকতার কী প্রয়োজন ছিল বুঝলুম না। এমনকি, মেনোত্তির মার্কিন বিদ্বেষেরও কারণ খুঁজতে আর দূরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। আদ্রিয়ানা আগে মেনোত্তিকে ভালোবাসত, এখন তাকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে নরসুন্দর সেবাস্তিয়ানোকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা অ্যামেরিকার আবিষ্কারের

আগে, এমন কি হিউম্যানিজমের আবির্ভাবের আগে ঘটেছে; এখন, যখন অ্যামেরিকা নাবালক থেকেও বিশ্বনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং হিউম্যানিজম প্রায় মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের পর্যায়ে পরিগণিত, তখনও হচ্ছে; এবং সন্দেহ নেই, দুই-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও হবে; তার জন্যে এত অবান্তর কথার অবতারণা কেন? আমি বললুম, "সিনিয়র মেনোত্তি, আমাদের শরৎবাবু তাঁর এক উপন্যাসে এক নাবালক নায়ককে দিয়ে বলিয়েছেন, 'স্ত্রীলোকের মন বড়ো চঞ্চল, বড়ো অবিশ্বাসী।' মিছে কেন এর বেশি কারণ খোঁজা? সিনিয়রা আদ্রিয়ানা একদিন আপনাকে ভালোবাসতেন, আজ ভালোবাসেন সিনিয়র সেবাস্তিয়ানো পণ্টেকর্ভোকে। অত্যন্ত শোকাবহ পরিণতি, সন্দেহ নেই; কিন্তু এতে অ্যামেরিকানদেরই বা দোষ কী? আর হিউম্যানিজমের পরাভবেরই বা পরিচয় কোথায়?"

আমি আবার কিয়াস্তিতে ওষ্ঠপাত ও আদ্রিয়ানাতে দৃষ্টিপাত করলুম।

সিনিয়র মেনোত্তি আমার হাতে চাপ দিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "এই তিনটিতে একে-অপরের মধ্যে অনিবার্য কার্যকারণ সম্বন্ধ, সিনিয়র—"

আমার পদবী না জানায় ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমি নিজের দেশের পাঠকের কাছেই নিজের নাম গোপন রেখেছি, বাইরের অপরিচিতকে নাম বলতে যাব কোন দুঃখে? তাই বললুম, "বলুন ইণ্ডিয়ানো।"

"তবে শুনুন, সিনিয়র ইণ্ডিয়ানো। আমি ইস্কুলে পড়াবার আগে ইস্কুলে পড়তুম। যুনিভার্সিটিতেও পড়েছি। তখন সুন্দরের সংজ্ঞা ছিল, তা-ই সুন্দর যা তোমার ভালো লাগে। সৌন্দর্যের বিচার তখন বিশেষজ্ঞের হাতে ছিল না, ছিল দর্শক আর উপভোক্তার চোখে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী,

আদ্রিয়ানার চোখ আর আমার চোখ যখন এক ছিল, আলাদা ছিল না, তখন নীল ফুলদানি জলগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আজ সেই দিনগুলি কোথায় কোন জলের তলায় তলিয়ে গেছে। আজ নীল ফ্রক্ তাই আদ্রিয়ানার গায়ে শোভা পাচ্ছে, আর নিক্ষিপ্ত হয়েছি আমি!"

মেনোত্তি লা গ্রিমি ক্রিস্টির শরণ নিলেন। আমার তখনো জানবার কৌতূহল ছিল যে স্পেশ্যালিজমের সঙ্গে না হয় যাহোক একটা সম্পর্কের সন্ধান মিলল, কিন্তু মেনোত্তির মনোবেদনায় মার্কিন 'অবদান' কোথায়? বলা বাহুল্য, এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। মেনোত্তি কাঁদছিলেন। সেই হাস্যকর নকল গোঁফজোড়ার উপর চোখের জল আরো বেশি করুণ হয়েছিল।

অচিরেই একটা সাউথ অ্যামেরিকান স্থাম্বা শুরু হলো। আর সেই সঙ্গে নিমেষে সমস্ত নর্তক-নর্তকী যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত হোলো। 'মত্ত' কথাটা অযত্নপ্রযুক্ত নয়। পুরনো পোষাকী নাচগুলিতে একটা স্বস্থতা আছে, শান্ত মাধুরী আছে; তার ধীর বিলম্বিত লয়ে অপরিসীম শালীনতা। নৃত্যরত নরনারীর মৃদু আশ্লেষে সেখানে শিষ্টতার শেষ নেই। য়োহান স্ট্রাউসের ওয়ালৎস্ নাচ প্রথম দেখে ভিয়েনার যে অতিশালীন অভিজাতকুল উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কায় শিহরিত হয়েছিলেন, তাঁরা আজকের এই মার্কিন জিটারবাগ দেখলে মূর্ছিত হতেন। আর বোধ হয় সংজ্ঞা ফিরে পেতেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাকে 'কটিদেশের নিম্নদেশের অসংযত সঞ্চালন' আখ্যা দিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, এ যে নৃত্যের নামে জিমন্যাস্টিকস!

ছেলেটি একবার মেয়েটির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারপর দু'জন দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে নানা অসুন্দর ভঙ্গী সহযোগে। মেজেয় লুটানো ক্রিনোলিন নয়, হাঁটুর উপরে কালো স্যাটিন। মৃদুতম গতিতে তার

উদ্দামতম উল্লাস। নর্তকীর পায়ের গতি মৃদু না হলে—এবং সেটা একান্ত স্বল্পায়ু বিরতি—স্যাটিনের পোষাকের উচ্চাভিলাষ আরও ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়ে ওঠে। নর্তকী নিঃসংকোচ। নর্তকের চিত্ত তখন আরও উত্তেজিত। ক্ল্যারিনেট আর ড্রাম আর ট্রম্বোনের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না সেই লেলিহান উত্তেজনায় ইন্ধন জোগাতে। নর্তকীর মুখে-চোখে, তার অগ্রপশ্চাতের আহ্বায়ক ইঙ্গিতে, কখনো বা করতালি সহযোগে স্পষ্টতর নিমন্ত্রণে, নর্তকের মনের মতি ও দেহের গতি প্রাণপণ চেষ্টা করছে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তার পরে মিলন ঘটে নর্তকীর সঙ্গে নর্তকের, পরমুহূর্তে নর্তক যেন সঙ্গিনীকে নিক্ষেপ করে দূরের কোন ঘৃণাকুণ্ডে। সঙ্গিনী আবার ফিরে আসে নর্তকের সান্নিধ্যে বা নর্তক ফিরে যায় নর্তকীর আকুতিতে—কিন্তু সেই অন্তিম মিলনও যেন ঘৃণা থেকে অভিন্ন!

এ যেন নাচ নয়, এ যেন মানুষের অবাধ্য প্রত্যঙ্গগুলির উন্মত্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

দ্রুত লয়ের এই নাচটিতেই দেখলুম আদ্রিয়ানা আর তার সঙ্গীর উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। এ নৃত্যে ওদের দু'জনের কৃতিত্ব যেন অন্যান্য নর্তক-নর্তকীরাও সানন্দে স্বীকার করে নিয়ে প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে ওদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল।

ঈষন্মত্ত অবস্থায় এমন দৃশ্য আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পরমানন্দে উপভোগ করি, সে সন্ধ্যায়ও তাই করতুম; কিন্তু আমার পাশে বসে আনন্দোচ্ছলা আদ্রিয়ানার বঞ্চিত অপমানিত স্বামী আমারই সঙ্গে সেই একই দৃশ্য অবলোকন করে পলে পলে মর্মে মর্মে দগ্ধ হচ্ছে, এ কথাটা ভুলতে পারছিলুম না কিছুতেই।

মেনোত্তিরও ভুলতে দেবার ইচ্ছা ছিল না, বলল, "আড্রিয়ানাকে এমন ময়ূরের মতো নাচতে দেখিনি অনেক দিন!"

কোন মেঘের ডাকে ময়ূরের সে উল্লাস, তা বুঝতে আমার বাকি ছিল না। মেনোত্তিরও নিশ্চয়ই নয়। তাই আমি শুধু বললুম, "সিনিয়রা সত্যি সুন্দর নাচেন।"

মেনোত্তি ইস্কুল মাস্টার তো। তাই তৎক্ষণাৎ বললেন, "ওই আবার সেই মেকানিক্যাল ইণ্টারপ্রিটেশন অব এস্থেটিক ফেনমেনা! ওই স্বতঃস্ফূর্ত নাচ যেন অন্তরের আনন্দের অনায়াস অভিব্যক্তি নয়, ও যেন বই মিলিয়ে হাত-পা নাড়া! দ্যাট পার্নিশাস অ্যামেরিকান ইনফ্লুয়েন্স এগেন!"

এবারে আমি না হেসে পারলুম না। এই মার্কিন-বিদ্বেষ যেন ভদ্র-লোকের মাথায় কী এক পোকা হয়ে ঢুকেছে! রাজনীতি নয়, তাহলে ইতিমধ্যে অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ প্রশংসা তাঁর আলোচনায় প্রক্ষিপ্ত না হয়ে পারতো না। বিদ্বেষটা প্রায় ব্যক্তিগত। আমি বললুম, "অ্যামেরিকার মুণ্ডপাত করে কী হবে? আপনার কথা বলুন।"

এতক্ষণ মেনোত্তি মর্মান্তিক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে বারবার পলায়ন করে অন্যান্য আলোচনায় আশ্রয় খুঁজছিল, যদিও একই সঙ্গে আপন আহত মনের পুঞ্জীভূত বেদনাও প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘশ্বাস গোপন না করে মেনোত্তি বলল, "সত্যি তাই। ম্যাকার্থি বা ম্যাকার্থারকে গাল দিয়ে কী লাভ হবে? এমনকি সেবাস্তিয়ানোকেই বা দোষ দেব কোন মুখে? আড্রিয়ানারই বা দোষ কী? মনে আছে, স্বল্পবেতন ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্যে আড্রিয়ানার মা যখন আড্রিয়ানাকে বুদ্ধিবিহীনা বলে অভিহিত করেছিলেন তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে সবিনয়ে বলেছিলুম,

'সিনিয়রা, আপনি কি এই চান যে ভেনিসের মেয়ে, আপনার মেয়ে, আদ্রিয়ানা প্রেমিকের আয় দেখে তার প্রেমে পড়বে? মাইনে কম হলে প্রেমিককে বলবে, 'বাড়ি যাও, আর কারো সঙ্গে প্রেম করোগে'? বেতন-স্বাধীন প্রেমের কোনো স্বীকৃতি নেই আমাদের দেশে? আমরা কি ইংরেজদের মতো বেনে হয়ে গেছি, না কী?' আমি জানতুম আমাদের এই জাতিগত দৌর্বল্যের কথা। প্রেমিকের এদেশে সাত খুন মাপ। ইংরেজরা প্রেমে পড়ে—যেন একটা শোচনীয় পতন। আমরা ল্যাটিনরা প্রেমে উঠি—ওটা আমাদের অন্যথা সাধারণ জীবনে মহত্তম আদর্শে আরোহণ। আমার ভবিতব্যা শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ আমার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় কারণ আর জিজ্ঞাসা করেন নি। প্রেমের সমর্থনে যদি বাইরের যুক্তি খুঁজতে হয়, যদি বলতে হয় প্রেমিকা সুন্দরী বা সে সঙ্গে অর্ধেক রাজ্য আনবে—তাহলে তাকে প্রেম না বলে বিচক্ষণ ব্যবসা বলাই ঠিক। মনে আছে, আমার প্রস্তাব নিয়ে আমি বলেছিলুম, 'আমি আদ্রিয়ানাকে ভালোবাসি, আদ্রিয়ানা আমাকে ভালোবাসে। তার বেশি আমরা নিজেরাই আর কিছু জানিনে, আপনাকে বলব কী? আপনিই বা কী আর জানতে চাইবেন?' সেদিন এইটুকুকেই সর্বথা সম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ—"

যোগ করা অনাবশ্যক, মেনোত্তির আলোচনা ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ অসম্বদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তার জন্যে লা গ্রিমি ক্রিস্টির দায়িত্ব কতটুকু, আর কতটুকু মেনোত্তির নিজের অশান্ত মনের অগোছালো চিন্তার প্রকাশ, তা আমার পক্ষে বোঝা সহজ ছিল না। আমি নিজেও তো কিছু এতক্ষণ খৃস্টাশ্রুর প্রতি উদাসীন থাকিনি।

তাছাড়া ব্যর্থ প্রেমিকের প্রলাপ আমি অনেক শুনেছি—হায়রে, নিজেও

কম করিনি—তাই এর প্রতি আমি কখনোই আর অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারিনে। নিঃশব্দে যখন সমবেদনা জানাই তার আন্তরিকতা অপর পক্ষও সন্দেহ করে না, তাই আরো বেশি করে বলে।

মেনোত্তি তাই একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে আবার বলে চলল, "কিন্তু আজ সেই চরম যুক্তিটা মেনে নিতেই সমস্ত অন্তবাত্মা বিদ্রোহ করছে। আজ যে আদ্রিয়ানা সেবাস্তিয়ানোকে ভালোবাসে, আর সেবাস্তিয়ানো আদ্রিয়ানাকে, সেইটুকুকেই শেষ কথা বলে মেনে নিতে পারিনে। আজ তাই জানতে চাই, আদ্রিয়ানা কেন সেবাস্তিয়ানোকে ভালোবাসে? যদিও আমার সম্বন্ধে আদ্রিয়ানাকে একদিন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্যেই ওর মাকে সূক্ষ্মানুভূতি-শূন্য ও স্থূলহৃদয় ব্যবসায়ী বলে মনে হয়েছিল। শুধু কি তাই? জানতে চাই আদ্রিয়ানা কেন আমায় আর ভালোবাসে না। প্রেম স্বয়ংসম্পূর্ণ, যুক্তিস্বাধীন অপ্রতিরোধ্য একটা অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু ঘৃণার তো নির্দিষ্ট কারণ থাকা চাই। আমরা কেউই জানিনে কেন কাউকে ভালোবাসি, কিন্তু কেন কাউকে ঘৃণা করি তার কারণ নিশ্চয়ই আমাদের অজানা থাকতে পারে না। কই, আদ্রিযানা তো আমায় তাও কিছু বলেনি। তাছাড়া, আচ্ছা আপনিই বলুন, প্রেমে কি লয়্যালটি বা নিষ্ঠা বলে কোনো বস্তু নেই?"

অনুরোধ সত্ত্বেও আমার কিছু বলবার ছিল না। বলবার দরকারও ছিল না। মেনোত্তি নিজেই তার যুক্তির প্রতিযুক্তিগুলি জানতো। তার নিজের হতাশার কারণও তার অজানা ছিল না। কিন্তু ডায়াগনসিস্ আর কিওর তো এক কথা নয়। তাই মেনোত্তির অকরুণ আত্মবিশ্লেষণে তার ব্যথার লাঘব হয় না, বেদনা বাড়ে অতিকৃত চেতনার জন্যে। আমি সেখানে সান্ত্বনা জোগাব কী দিয়ে?

মেনোত্তি নিজেই বলল, "পড়ে থাকবেন, বায়রনের চিঠিতে বা আর কোথাও, আমরা ভেনীসিয়ানরা স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাহীনতার উপর তেমন একটা গুরুত্ব আরোপ করিনে, নিজেই স্বামী না হলে। আমার কথা কিন্তু সেই বিলাপ বলে মনে করবেন না। আমার কান্না সম্পত্তি হারিয়ে কান্না নয়। আমার দুর্ভাগ্য কী জানেন, সিনিয়র ইগুিয়ানো, আমি আড্রিয়ানার শুধু স্বামী নই, আমি আড্রিয়ানার প্রেমিকও!"

আবার সেই মধ্যবয়সী মেনোত্তি প্রায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। আমি নিতান্ত বিব্রত বোধ করলুম, কিন্তু নিরুপায় আমার কিছু করবারও ছিল না। মেনোত্তি ইতিমধ্যে তার নকল গোঁফ খুলে ফেলে পকেটে রেখে দিয়েছিল।

আমি এইবার প্রথম ভালো করে তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। বয়স পঞ্চাশের এপারে, পঁয়তাল্লিশের ওপারে। দৈর্ঘ্যে স্বাভাবিক ইটালিয়ানদের মতোই, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ ফিটের খুব বেশী নয়। একটু স্থূলকায়, কিন্তু সোজা হয়ে বসলে তেমন মোটা বলে মনে হয় না। সব মিলিয়ে অবিশিষ্ট আকৃতি, কিন্তু অসুন্দর নিশ্চয়ই নয়। বাঙালী হলে রোজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতো লালদীঘির পেভ্‌মেণ্ট থেকে পাঁচ মেয়ের জন্যে চুলের ফিতে কিনে, আর শ্রীরামপুর স্টেশনে নেমে উদ্বাস্তু ফেরিওয়ালার কাছে সস্তায় ন্যাপথালিন কিনে এনে তা তুলে দিতো খুকীর মার হাতে। ইংরেজ হলে মেনোত্তি সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড কিনে বাড়ি ফিরে লিটলউড'স ফুটবল পুলের ফর্ম ভর্তি করতে বস্‌তো। স্ত্রীর হৃদয়ে প্রেমের শীতলতার চিন্তায় বিন্দুমাত্র উত্তপ্ত হোতো না।

কিন্তু মেনোত্তি সাধারণদর্শন হলেও ইটালিয়ান, তাই তার প্রধান চিন্তা

প্রেম। সেই প্রেম যদি আপন স্ত্রীর জন্যে না হয়ে অন্য কোনো নারীর জন্যে হোতো, তাহলে মেনোত্তির অবস্থা এমন মর্মান্তিক ও হাস্যকর হোতো না। অমন ব্যর্থ প্রেমের দুঃখ বা লজ্জা ভেনিসে গোপন করতে হয় না। তার প্রকাশ্য ব্যাখ্যানে সপ্রশংস সহানুভূতিও দুর্লভ নয়। কিন্তু বঞ্চিত স্বামীর ভূমিকা একেবারেই বিভিন্ন, মঞ্চে তার ডাক পড়ে শুধু হাস্যরস জোগাতে। মেনোত্তির অবস্থা আরো বেশি হাস্যকর এই জন্যে যে আড্রিয়ানা তাকে ঠিক ঘৃণা করেনি, শুধু অবহেলা ও উপেক্ষা করেছে। মেনোত্তির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা বা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থাকলে তাই নিয়ে বিবাদ চলতো। উদাসীনতার উত্তর কী?

আমার এতক্ষণে মনে পড়েছিল যে, মিলানে লা স্কালায় আমি ভার্দির 'অটেলো' দেখতে পাইনি। মেনোত্তির করুণ খেদোক্তিতে অসহায় অটেলোর বিলাপের সুরের প্রতিধ্বনি ছিল। তবে কি মেনোত্তিরও সেই পরিণাম? হতাশা কি এখন স্থান ছেড়ে দেবে জিঘাংসু ঈর্ষার জন্যে? এখন কি এই পিয়াৎসা সান মার্কোতে মেনোত্তি লাফিয়ে পড়বে ওই সেবাস্তিয়ানোর উপর? তারপর চরম বোঝাপড়া করবে আড্রিয়ানার সঙ্গে? যাকে হারিয়েছে তাকে অন্য কারো হাতে দেখতে যাতে না হয়? সুখ যে কেড়ে নিয়েছে তার বিকল্প সুখের সম্ভাবনা লুপ্ত করে দেবে?—এই ভাবালু ল্যাটিনদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাই আমার আশঙ্কার অন্ত ছিল না।

কিন্তু অটেলোর পরে বহু যুগ গত হয়েছে। শেক্সপীয়রের নাটকটির বয়স প্রায় সাড়ে তিন শ বছর। ভার্দির অপেরার বয়সও ষাট বছরের বেশি। তাই আমার যেমন তুলনীয় পরিস্থিতিতে তুলনীয় চরিত্রের কথা মনে হয়েছে, মেনোত্তির মনেও সে সাদৃশ্য অনুদিত থাকে নি।

সাহিত্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো জীবনোপভোগ সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু বোধহয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

আজ তাই সরাসরি নদী দেখে তাই থেকে আনন্দ আহরণ করতে পারিনে; আনন্দকে হৃদয়ে পৌছোতে হয় রবীন্দ্রনাথের কোনো অবিস্মৃত উদ্ধৃতির পথ ধরে। মেনোত্তিকে দেখে আমার মনে প্রত্যক্ষ কোনো অনুভূতি জাগতে পায় না, সাহিত্যিক প্রিসিডেণ্ট-এর শরণ নিতে হয়।

তার চেয়ে বড়ো ক্ষতি, মেনোত্তি নিজেও মুখোমুখি তার সঙ্কটের সম্মুখীন হতে পারে না, যেমন পারতো অটেলো-না-পড়া যে কোনো স্বাভাবিক বঞ্চিত স্বামী।

মেনোত্তি তাই বলল, "আপনি এত গম্ভীর কেন? চতুর্দিকে আনন্দের ঝড় বয়ে চলেছে, আর আপনাকে দেখলে কেউ মনে করবে আপনি শ্মশানবন্ধু হয়ে এসেছেন।"

মেনোত্তির কথা এতই সত্য ছিল যে, আমাকে বলতে হোলো, "আপনিও আমায় কই একেবারে হাসির গল্প তো শোনাননি।"

"হাসির কেন, কোনো গল্পই শোনাইনি। গল্প হলে আর—"

অনতিদীর্ঘ বিরতির পরে আবার নৃত্যের পালা। আবার সেই বাজনা; আবার সেই বন্য পদক্ষেপের পরে বন্যতর দেহক্ষেপ। সবাই নৃত্যে এমন মগ্ন যে সন্দেহ করবারও উপায় ছিল না এরা সুখের সন্ধানে এসেছে। আমি সেই কথাই বলছিলুম মেনোত্তিকে। মেনোত্তি বলল, "তা বটে। মনে নেই, কোন এক ফরাসী পণ্ডিত যেন এমনি এক নৃত্যোৎসবে গিয়ে

বলেছিলেন,—Je n'ai jamais vue des figures si triste ni des derrieres si gais !"

আমি হেসে বললুম, "ভাগ্যিস কথাটা ফরাসিতে বলেছেন। কিন্তু কথাটা সত্যি। শুধু তাই নয়, উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত প্রত্যঙ্গেরই কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ। মুখে কথাও নেই, হাসিও নেই।"

দু'জনেই এবার ধারাভাষ্য স্থগিত রেখে পিয়াৎসা সান মার্কোর কেন্দ্রস্থলে দৃষ্টিক্ষেপ করলুম। আমাদের নির্লিপ্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের দু'টি ব্যতিক্রম ছিল এবং তাদের দু'জনের একজনও আমাদের দু'জনের লক্ষ্য এড়ায়নি। আদ্রিয়ানা ও সেবাস্তিয়ানোর নৃত্যমত্ততায় সত্যি কোনো গতানুগতিকতার আভাস ছিল না। আন্তরিক আনন্দে তারা ছিল আচ্ছন্ন। তারা নাচের আইনে দূরে সরে গেলে বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়ছিল; নাচের আইনের অনুমতিতে কাছে এলে আনন্দে উপচে পড়ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি বঞ্চিত ঈর্ষিত স্বামী নই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি সেবাস্তিয়ানোর পরাস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী নই। তাই সেই প্রেমপ্ররোচিত নৃত্যানুষ্ঠানের আনন্দপ্লাবিত দর্শক হতে আমার অন্তত কোনো বাধা ছিল না। আমি তাই আমার কিয়াস্তি-ক্লান্ত চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ওদের আনন্দযজ্ঞে স্বেচ্ছাপূজারী হয়েছিলুম।

কিন্তু মেনোত্তি বোধহয় এই নিষ্ঠুর দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছিল না। হঠাৎ আমার হাত ধরে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, "বন্ধু, অনেক বাজে বকেছি, আর নয়। অনেক ধন্যবাদ এই লা গ্রিমি ক্রিস্টি আর বিলিতি সিগারেটের জন্যে। আর একটা দয়া করবে? আমি যা কিছু বলেছি, সব ভুলে যাবে। কাউকে কখনো এর একবর্ণও বলবে না। তোমাকে সব বলেছি এইজন্যেই যে তুমি বিদেশী।"

আমি বললুম, "ভয় করবেন না। আমি শুধু বিদেশী নই। ভেনিসে এই আমার প্রথম ও শেষ রাত্রি। কাল সকাল সাড়ে সাতটার গাড়িতে রওনা হব ফিরেনৎসার দিকে। তারপর রোম, নেপলস, সোরেন্তো, কাপ্রি, নেপলস, জেনোয়া, ট্যুরিন, প্যারিস, লণ্ডন, বম্বে, তারপর ঘরের ছেলে ঘরে, কলকাতা। কাকে বলব আপনার কথা? আর কেনই বা?"

"ভালো কথা। কিন্তু বন্ধু, আমি তোমার সঙ্গে বসে এই দৃশ্য আর তোমার মতো উপভোগ করতে পারছিনে। আমিও এখানে আসবার আগে মনে-মনে বলেছিলুম, ঈর্ষা তো গুহামানবের মনের যোগ্য। আমি সভ্য মানুষ। ঈর্ষার স্থান কোথায় আমাব মনে? আমি শুধু ছদ্মবেশে পিয়াৎসা সান মার্কোতে এসে আমার পত্নীর প্রাণময় প্রণয়লীলা প্রত্যক্ষ করব, যেমন তুমি করছ; নিরাসক্ত দূবদর্শীর মতো। ভেবেছিলুম, কখনো হাসব, কখনো বিরক্ত হবো; কাঁদব না কখনোই। কান্না? সে তো শিশুর ভাষা। আমি ইস্কুল-মাস্টার। আমি শিক্ষিত ইটালিয়ান। আমি বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ। আমি কেন বিচলিত হব স্ত্রীজাতির চঞ্চলতাব? এসব তো আমাব জানা কথা। আমি তো নানা বইয়ে পড়েছি যে—"

মেনোত্তিকে থামতে হলো। নতুন কথা খুঁজতে নয়, পুবানো কথা লুকোতে।

তারপর আবার বলল, "কিন্তু নিজের জীবনে যখন এসব ঘটনা ঘটল, তখন দেখলুম যে যা কিছু পড়েছি তার সব মিথ্যে। অন্য কারো দাঁত ব্যথা হলে আমরা পরমানন্দে উপদেশ বিতরণ করে বলতে পারি, 'মনে করো ওটা তোমার দাঁত নয়। ও দাঁতের ব্যথা তোমার ব্যথা নয়।' কিন্তু নিজের উপর

কোনো আঘাত না এলে সত্যি আমরা সে আঘাতের তাৎপর্য জানিনে। যে রাজা ভিখারীর কথা ইনিয়ে বিনিয়ে লেখেন, তিনি আর সকলের হৃদয় হরণ করতে পারেন নানা চাতুরী দিয়ে, কিন্তু ভিখারী সে লেখার প্রথম লাইন পড়েই জানবে যে ওর সবটাই মেকি। আমি কম্যুনিস্ট নই, তাই যোগ করছি, আধা-ভিখারী বা মধ্যবিত্ত যখন উপরতলার কথা লেখে, তখন সে লেখাও ঠিক তেমনি মিথ্যা হয়। ইটালিতে আজ এই দু'রকমের লেখাই প্রচুর লেখা হচ্ছে। বোধ হয় তোমার দেশেও।”

আমি তখন আমার দেশের লেখার খবর রাখছিলুম না। তাই বিশেষ কিছু না বলে মেনোত্তির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালুম। যেন একমত অথচ একমত নই।

মেনোত্তির সেদিকে সামান্যতম লক্ষ্য ছিল না। সে ছিল তার আপন চিন্তায় মগ্ন। বলল, “এখানে এই নকল গোঁফ পরে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, এই রূপসজ্জা শুধু আমার আকৃতির পরিবর্তন ঘটাবে না। ভেবেছিলুম আমি এমন নতুন লোক হব যে, আমি নিজেকেই চিনতে পারব না। ভেবেছিলুম আমি এখানে শুধু দর্শক হয়ে জেনে যাব যা আগেই জানতুম। আদ্রিয়ানা যে সেবাস্তিয়ানোকে ভালবাসে তা আগেও জানতুম। মানে, আন্দাজ করেছিলুম। তবু কাল আদ্রিয়ানাকে বললুম, আমি মিলানোয় যাচ্ছি ওখানকার য়ুনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা করতে। আদেশ এসেছে উপর থেকে। আদ্রিয়ানা জানতো যে আমি অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপারে যতই অযোগ্য হই না কেন, আমি মিথ্যা কথা বলিনে। আদ্রিয়ানা আমার কথা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করল, আর তাই দেখে আমার অনুতাপের সীমা ছিল না। এর আগেও আমি ঠকেছি, কিন্তু ঠকাইনি।

তখন যেন মনে হোলো, আমি আদ্রিয়ানার পর্যায়ে নেমে এসেছি। তবু সে ভাব গোপন করলুম। আদ্রিয়ানা তখন যদি আমার আসন্ন অন্তর্ধানে উল্লসিত হোতো, অন্তত কিছু না বলে দূরে থাকতো, তাহলেও বুঝতাম। কিন্তু আদ্রিয়ানা আমার কথা শুনে অপ্রত্যাশিতভাবে বিচলিত হোলো। তার কোমল বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল। সত্য বলছি, আমার একবারও তখন মনে হয়নি যে, সেই বাহু ইতিপূর্বে অপর কারো কণ্ঠ ঠিক এমনি ভাবে ( কিম্বা এর চেয়েও সপ্রেমে ) জড়িয়ে ধরেছে। শুধু তাই নয়, আদ্রিয়ানা বলল, 'না গেলেই নয়?' আমি তখন ঠিক এই কথাই বলতে চাইছিলুম যে, 'যেতে আমি চাইনে, শুধু তুমি যদি বলো আমায় থাকতে।' কিন্তু সাহস পাইনি। যদি আদ্রিয়ানা তার নিজের মনের কথা গোপন রেখে স্মরণ করিয়ে দেয় আমার কর্তব্যের কথা। যদি সে বলে, আমার যাওয়াই উচিত। তাই ভীরুর মতো সভয়ে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললুম, যেতে আমাকে হবেই, যদিও তখনই জানতুম যে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এখানে বসে আমার কল্পিত অনুপস্থিতিতে আমার স্বামিপ্রাণা পত্নীর কীর্তিকলাপ প্রত্যক্ষ করা। একা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য করতে পারতুম না। হয়তো পাগলের মতো কোনো কিছু করে বসতুম। তোমার সাহচর্যে সেই হাস্যকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। তোমাকে সেজন্যে ধন্যবাদ।"

ধন্যবাদিত হতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। আমি চাইছিলুম আমার ভেনিস-ভ্রমণ উপভোগ করতে। বোধহয় বিরক্তি বা নৈরাশ্য আমার দৃষ্টিতেও প্রতিফলিত হয়ে থাকবে। বলা বাহুল্য, এতক্ষণ যে পরিমাণ কিয়াস্তি ও লা গ্রিমি ক্রিস্টি গলাধঃকরণ করেছি তা আমার অভ্যন্তরে গিয়ে অকর্মণ্য থাকেনি। আমার তখন মেনোত্তি-সঙ্গে অরুচি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বললুম, "সিনিয়র মেনোত্তি, আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। এখন বরং বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে আমার সান্ত্বনায় উত্তেজনা প্রশমিত হবে না, বাড়বে। মেনোত্তি বলল, "বাড়ি আমার আর নেই। মূর্তি সরিয়ে নিলে মন্দির কি আর মন্দির থাকে? না, গৃহিণী চলে গেলে গৃহ আর গৃহ থাকে?"

"তা বটে।" এর বেশি আমি আর কী বলতে পারতুম?

মেনোত্তি একটু পরে বলল, "আর তোমায় বিরক্ত করব না। যাবার আগে তোমার কাছে শেষ একটা অনুগ্রহ চাইব। তুমি বলছিলে না যে কাল সকালের গাড়িতে ফিরেনৎসা যাবে? স্টেশনের কাছেই সেবাস্তিয়ানোর স্যালুন। এই চিঠিটা ওখানে ফেলে দিয়ে যাবে। তাহলেই আদ্রিয়ানার হাতে পৌছোবে।"

মেনোত্তির হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আমি পকেটে রেখে দিলুম। আমার নিজের চিঠি ডাকে দিতে মনে থাকে না। কিন্তু মেনোত্তিকে কথা দিলুম, তার চিঠি ঠিক জায়গায় কাল সকালে পৌছে দেব। মেনোত্তি আবার ধন্যবাদ দিল। তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে এক চুমুকে সামনের গ্লাসটা শেষ করে বলল, 'গুড বাই!' তার পর সান মার্কোর চতুর্দিকে তাকিয়ে আর সবাই এবং সব কিছুর কাছ থেকেও যেন বিদায় নিল। বলল, 'গুড বাই!' তার পরেও আরেকজনের কাছ থেকে বিদায় নেয়া বাকি ছিল। প্রায় মনে মনে বলল, 'আদ্রিয়ানা, গুড্ বাই!'

সেই কোলাহলমুখরিত জনারণ্যে আমার এক সন্ধ্যার বন্ধু মেনোত্তি

কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার আমি একা রইলুম। সঙ্গী শুধু কিয়াস্তি। কিয়াস্তির করুণায় অপ্রীতিকর পারিপার্শ্বিক সহনীয় হয়। অসহিষ্ণুতার লাঘব হয়। কিন্তু তার জন্যে প্রচ্ছন্ন কিছু মূল্য দিতে হয়। আংশিক স্মৃতিবিভ্রম অবশ্যম্ভাবী। শব্দের অর্থ গ্রহণেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে। তাই মেনোত্তির সব কথা যেমন আমার মনে নেই, তার শেষ কথাগুলির পূর্ণ তাৎপর্যও সেই মুহূর্তে আমি সম্যক বুঝতে পাবিনি। আমি শুধু মেনোত্তিব দুঃখে অর্থহীন অশ্রুবিসর্জন স্থগিত রেখে দ্বিগুণিত উৎসাহে আপন উপভোগে মনোনিবেশ করেছিলুম।

কী কী করেছিলুম তার সব মনে নেই। যা মনে আছে তার কিছুটা অমুদ্রণযোগ্য, সবটাই অপ্রাসঙ্গিক। পিয়াৎসা সান মার্কোর সব দোকানগুলি যখন বন্ধ হয়েছিল তখন রাত একটা কি দেড়টা। তার পর, অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে, কোনো একটা নাইট ক্লাবে গিয়েছিলুম। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে কোথাও একটু ঘুমিয়ে থাকব। সকাল আটটায় হোটেলে গেলুম মালপত্র নিতে।

আমার স্যুটকেসের চাইতে ভারী ছিল আমার নিজের মাথাটা, ওটাকে বহন করতে আরো বেশি কষ্ট হচ্ছিল। পিয়াৎসা সান মার্কোয় তখন পায়রার ভীড়। আমি জল-বাসে উঠে নানা উত্তেজিত আলোচনা শুনতে পেলুম, কিন্তু কান দিলুম না।

স্টেশনে পৌঁছে একটা ইংরেজী কাগজ কিনলুম। কিন্তু তা পড়বার উৎসাহ বা সাধ্য ছিল না। কী নিয়ে এত উত্তেজনা তাও জানতুম না। শ্রান্ত মনে ভেবেছিলুম, এই ইটালিয়ানদের উত্তেজনা কলকাতা কর্পোরেশনের ছুটির মতো, যে কোনো অজুহাত যথেষ্ট। আমি ব্যস্ত ছিলুম আমার মাথা ব্যথা নিয়ে। আমি চেষ্টা করছিলুম বিগত রাত্রির কথা বিস্মৃত হতে।

অভিজ্ঞতার আগুন নিভে গেছে, কী হবে স্মৃতির ছাই বয়ে বেড়িয়ে?

আমি কোনোক্রমে পকেট থেকে দুটো অ্যাস্পিরিন বের করে স্টেশনের রিস্তোরাস্তেতে এক কাপ কফির সঙ্গে সেবন করলুম। সেখানেই জানলুম যে ফিরেনৎসার গাড়ি ছাড়তে দু'ঘণ্টা দেরি হবে।

এখন এই দু' ঘণ্টা আমি করি কী? যদি কোথাও একটু শুয়ে পড়তে পারতুম, তাহলে তাই হোতো সব চেয়ে ভালো। কিন্তু তার উপায় ছিল না। স্টেশনে ভীড় ছিল। গোলমাল ছিল তার চেয়ে বেশি। হঠাৎ গালে হাত দিয়ে দেখলুম—প্রথম স্পর্শে মনে হোলো ওটা যেন আমার গাল নয়—দেখলুম, আমি যখন সজ্ঞান অস্তিত্ব থেকে এক রাত্রির জন্যে ছুটি নিয়েছিলুম তখন শরীরের অন্যান্য প্রক্রিয়া বন্ধ থাকেনি। একটা কোথাও দাড়ি কামাতে যাওয়া দরকার। বিশ্রামও হবে, ভদ্রতাও রক্ষা করা হবে।

বেশি দূর যেতে হয়নি। কিন্তু, যেমন হয়ে থাকে মত্তরাত্রির পর-প্রভাতে, সামান্য দূরত্বও অন্তবিহীন পথ বলে মনে হয়, মৃদু রৌদ্রের আভাও অসহ্য জ্বালা আনে।

বার্বিয়েরের আশ্রয়ে এসে বিশ্রাম মিলল, কিন্তু কোলাহল থেকে মুক্তি মিলল না। এখানেও সেই উত্তেজিত আলোচনা চলেছে, যেমন চলেছিল স্টেশনে আর তার আগে জল-বাসে। অবিশ্রান্ত ত্বরার সঙ্গে ওরা কী বলছিল ওরাই জানে। আমার কানে মাঝে মাঝে একটা অর্ধপরিচিত নাম বা অল্প-পরিচিত ইটালিয়ান কথা ভেসে আসছিল। দুয়েকবার 'মেনোত্তি' নামটাও শুনে থাকব, কিন্তু এটা ওদের মধ্যে আদৌ দুর্লভ নাম নয়। দুয়েকবার শুনছিলুম 'ইল দিসাস্ত্রো,' বা 'ইনক্রেদিবিল।' এই শব্দগুলির ব্যবহার ওদেশে আরো বেশি সুলভ। অতিশয়োক্তি ওদের মজ্জাগত। আমি তাই যতদূর

সম্ভব ওদের কথা অগ্রাহ্য করে চোখ বুজে চেয়ারে বসেছিলুম। মাথাটা সঁপে দিয়েছিলুম ইটালিয়ান নরসুন্দরের দক্ষ হাতে।

একটু পরেই দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে বিরাট এক শোভাযাত্রার আগমনধ্বনি শোনা গেল। আমার নাপিত তৎক্ষণাৎ আমায় ফেলে সেই মজা দেখতে এগিয়ে গেল। ফিরে এসে বিরক্তি গোপন না করে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হচ্ছে রাস্তায়? কিসের মিছিল?"

ভাঙা ইংরেজিতে, অর্থাৎ ভাঙা আমেরিকানে, হাত-পা ছুঁড়ে নাপিত আমায় যা বলল তা আমার ভারতীয় কানে ঠিক রোমহর্ষক বলে শোনাল না। কাছেই কোথাও আগুন লেগেছিল। তিনটি দোকান পুড়ে গেছে। আর দুটি বাড়ি। কিন্তু সে কী ভীষণ আগুন! আকাশ লাল হয়ে গিয়েছিল।

আমি তার অত্যুক্তি বন্ধ করতে বললুম, "কিন্তু মিছিল কেন?"

"মিছিল ঠিক নয়। ওরা গীর্জায় যাচ্ছে।" আমার নাপিত সাবান-মাখা ক্ষুরটা হাতে নিয়েই বুকের সামনে শূন্যে ক্রস আঁকল।

"ওরা গীর্জায় যাচ্ছে। কাল রাত্রের আগুনের জন্য স্পেশাল সার্ভিস আছে।"

"ভগবানকে অভিশাপ দিতে বুঝি?" অগ্নিকাণ্ডের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার কথা নিশ্চয়ই উঠতে পারে না!

ইটালির নাপিত পার্ট-টাইম নাপিত মাত্র। তার আসল পেশায় সে দার্শনিক। আমার নাপিত বলল, "সিনিয়র তা বলতে পারেন বৈকি। দুর্ঘটনাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করা শক্ত; এদিকে মানুষকেও দোষ দিতে পারা যায় না, পারলে তাকে তো আর দুর্ঘটনা বলিনে! কিন্তু, ঈশ্বরের কথা বাদ দিয়ে, এমন পরীক্ষা না এলে মানুষ তার মহত্ত্বের পরিচয় দিত কী

করে? সামান্য ইস্কুল-মাস্টারের মধ্যে যে সেণ্ট লুকিয়ে ছিল তার বিকাশ হোতো কী করে?"

আমি বুঝতে পারছিলুম না সে কার কথা বলছিল। জিজ্ঞাসা করলুম।

নাপিত বলল, "সিনিয়র হাতের কাগজটা খুলে পড়েননি বুঝি এখনো! এই আমাদেরই পাড়ার ইস্কুলের মাস্টার কাল সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি ঘুমন্ত শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু সেই খৃস্টেরই মতো—আর সবাইকে বাঁচিয়েছেন, নিজেকে বাঁচাতে পারেননি!" অভিভূত নাপিতের কণ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি বললুম, "সেই মৃত মাস্টারের জন্যেই বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা বুঝি?"

"এখন সে আর মাস্টার নেই, সিনিয়র। সে মার্টার হয়ে গেছে।"

আমার ক্ষৌরকার্য শেষ হলে যখন রাস্তায় বেরোলুম তখন আমার শিরঃপীড়া বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে। রৌদ্রের সঙ্গে শত্রুতা কমেছে। তৃষ্ণার সঙ্গে সন্ধি হয়েছে। ক্লান্তি পুরোপুরি কাটেনি, কিন্তু তখন প্রায় সুস্থ হয়ে এসেছি। সে অবস্থায়, অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, একটি ক্ষুদ্র কিয়ান্তি অবশ্য-সেবনীয়। আমি তারই সন্ধানে একটা দোকানে প্রবেশ করলুম।

সেখানেও সেই একই আলোচনা! সবারই মুখে এক কথা। 'মার্টার!'

এদেশে পরিচিত হবার জন্যে অপেক্ষার প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে এমন জনচিত্ত-আলোড়নকারী ঘটনার পরমুহূর্তে। সত্যি সেদিন সারা ভেনিসে আর দ্বিতীয় কোনো আলোচ্য বিষয় ছিল না কারো মুখে। কাফেতে আমার পাশের লোকটি বললেন, "ক্যাথলিকদের মিছিল দেখেছেন একটু আগে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

"ওরা আজ ভোর না হতেই ভ্যাটিকানে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছে। মেনোত্তিকে যেন মার্টার বলে গণ্য করা হয়। সমগ্র ভেনিসের এই দাবীর কী উত্তর আসে দেখা যাক!"

বলা বাহুল্য, এই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশীর পক্ষে কোনো মতামত প্রকাশ করা অশোভন হোতো। আমি তাই চুপ করে ছিলুম। একটু পরে দেখা গেল আবার এক বিরাট শোভাযাত্রা যাচ্ছে। এদের হাতে লাল ঝাণ্ডা। আমি কিছু বুঝতে না পেরে পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকালুম, কিন্তু তিনিও মিছিল দেখছিলেন সাগ্রহে। আমি বেরিয়ে দেখলুম, মিছিলের অগ্রণীদের হাতে বিরাট পোস্টার। তাইতে দেখলুম, লেখা রয়েছে, "মেনোত্তির শেষ কথা: আমি মরি, কিন্তু পার্টি বাঁচুক!"

রাস্তায় বেরিয়ে আমার গতিনির্দেশের স্বাধীনতা ছিল না। জনস্রোত যেদিকে চলেছিল আমাকে সেই দিকেই যেতে হোলো। অদূরেই একটা মাঠে পৌঁছে দেখি বিরাট সভার আয়োজন হয়েছে। আমি বিদেশী বলে কয়েকজন কাছে এসে মহোৎসাহে বলে গেল, "বীরকে সবাই পূজো দেয়। বিদেশীও। তোমাকে এই সভায় দেখে সত্যি খুশি হয়েছি। বীরের দেশ নেই। কাল নেই।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এক বুড়ী সভায় এসেছে অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে আপন মনে বলল, "হায় ভগবান, ভেনিসের সব ছেলে কেন আলবের্তো মেনোত্তির মতো হয় না।"

যুবক-যুবতী সবাই বুক ফুলিয়ে চলেছে, "ভেনিসের ছেলে না হলে এমন আত্মোৎসর্গ কেউ করতে পারে? ইটালির প্রথম পুনরভ্যুত্থানের দীপ্তি আজো অম্লান। দ্বিতীয় পুনরুজ্জীবনে পৃথিবীর বিস্ময় সহস্র বছরেও

কাটবে না। সেই জাগরণ যে আসন্ন মেনোত্তি তার প্রাণ দিয়ে তাই প্রমাণ করে গেল।"

প্রত্যেকেব মুখে ওই এক নাম, ওই এক কথা। আমি নিবিবিলি একটা জায়গায় বসে ভাবছিলুম—কেননা আমার ট্রেনের তখনো দেরি ছিল—ভাবছিলুম যে এই ইটালিয়ানদের সম্বন্ধে কত মিথ্যা ধারণাই না পোষণ করেছি দূর থেকে। কেউ একটা কাজের মতো কাজ করলে আজো এই বৃহৎ জাতিটির সামষ্টিক চিত্ত কী গভীরভাবে মথিত হয়, কী অভাবনীয় একতার সঙ্গে সাড়া দেয়! বাইবে যে বিভেদ রোজ খবরের কাগজে ছাপা হয় সে তো শুধু এই জন্যে যে ঐক্যবিধায়ক কোনো ঘটনা রোজ বোজ ঘটে না।

সভাপতি সভা শুরু কবলেন। তাঁরই আদেশে সমবেত সবাই তিন মিনিটের জন্যে উঠে দাঁড়াল। তিনিই তারপব ঘোষণা কবলেন, "প্রথমে বলবেন শহীদ আলবের্তো মেনোত্তির পত্নী, সিনিয়রা আদ্রিয়ানা মেনোত্তি।"

কালো পোশাক পরা একটি মহিলা সভাপতিব হাত ধবে প্ল্যাটফর্মে আবোহণ করলেন। এমনিতেই আমাব ১০·৭৫ চশমা নিয়ে আমি দূব থেকে সব কিছু ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না; তাব উপর শোকাচ্ছন্না বিধবা মাইক্রোফোনের সামনে এসেই আর অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সববে কাঁদতে থাকলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সভাব সবাই কাঁদতে শুরু করল। এমন কম্যুনিটি কান্না আমি এর আগে দেখিনি। লৌকিকতা নয়, সমবেদনাব প্রদর্শনী নয়, সত্যি বেদনা-প্রসূত, যেন একান্ত নিকট কোনো আত্মীয়েব মৃত্যু হয়েছে সমবেত প্রত্যেকের।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মহিলা মুখ তুললেন। চোখের জল তখনো থামেনি।

স্বর তখনো স্পষ্ট হয়নি। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মহিলা বললেন, "আলবের্তো ছাড়া— !"

মহিলা ভেঙে পড়লেন। আর কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু সভার সবাই যেন বুঝল সিনিয়রা মেনোত্তি কী বলতে চেয়েছিলেন। ইটালিয়ানরা আর কিছু না জানুক প্রেমের মূল্য জানে। জানে প্রেমিক মরলে সে শুধু নিজে মরে না, প্রেমিকাকেও অর্ধমৃত রেখে যায়। জানে অমন পতিপ্রাণা সুন্দরী স্ত্রী স্বামী হারালে বক্তৃতা করতে পারে না, কিন্তু তার নীরব বেদনা প্রতিধ্বনিত হয় ইটালির প্রতি নারীর হৃদয়ে। আমারই আশেপাশে একাধিক অভিভূতা ক্রন্দনরতা মেয়ে যেন ঠিক এই কথাই ভাবছিল।

কিন্তু আমার ট্রেনের সময় হয়ে আসছিল। ত্রস্তপদে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে আবার ভাবছিলুম ওই আবেগপ্রবণ ইটালিয়ান জাতিটার কথা। নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের প্রতি কী স্বতঃস্ফূর্ত এদের সাড়া! যে জাতি এমন প্রাণ খুলে কাঁদতে জানে, সে শুধু অন্যান্য জাতিকে ভয় পাওয়াতে জানে না বলে বাঙালীর কাছেও অবজ্ঞাত বা উপহসিত হবে?

স্টেশনের কাছাকাছি আসতে দেখলুম আরো দুটো শোভাযাত্রা চলেছে ওই সভার দিকে। এক দলের হাতে একটা বিরাট পোস্টার—তাইতে আঁকা আছে শহীদের প্রতিকৃতি। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

এতক্ষণ এতবার 'মেনোত্তি' নামটা শুনেছি। এমনকি, আলবের্তো মেনোত্তি। কিন্তু নানা উত্তেজিত কোলাহলের চাপে বিগত রাত্রির স্মৃতি আমার মন থেকে এতক্ষণ একেবারেই মুছে গিয়েছিল। একবারও সন্দেহ

হয়নি যে সমগ্র ভেনিস আজ প্রভাতে যে শহীদের মৃত্যুতে শোকাকুল সে আমার কাল রাত্রির পানসঙ্গী আলবের্তো মেনোত্তি হতে পারে। এতক্ষণ যা আমার কাছে ইটালীয় জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণে সহায়ক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র ছিল, মুহূর্তে তা একান্ত ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। স্মৃতির অস্পষ্টতায় প্রাথমিক অবিশ্বাস তখনো জীবিত ছিল, কিন্তু মনের কোথাও একটু গর্ববোধ থাকাও বিচিত্র নয় যে আমারই পরিচিত কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে চিরজীবী হয়েছে।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে অগ্নিকাণ্ডের যে বিবরণ পাঠ করলুম তা সেই সকালে নানা জায়গায় যা শুনেছিলুম তা থেকে বিভিন্ন নয়। সত্যি বেশ বড়ো রকমের আগুন লেগেছিল। সত্যি সেই গোলমালে কারো মনে হয়নি যে আগুনে ঘেরা কোনো ঘরে একটি ঘুমন্ত শিশু ছিল। তার মা যখন ছুটে এসে রোল তুলল তখন সবাই আর-সবায়ের দিকে তাকাল, কেউ এগিয়ে গেল না শিশুটিকে বাঁচাতে। কিন্তু একজন পথচারী হঠাৎ কোথা থেকে এসে, শিশুটির কথা শুনে, নিজের সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অল্পদগ্ধ শিশুটিকে যেন মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনল। শিশুটি মায়ের কোলে ফিরে বাঁচল, কিন্তু তাকে যে বাঁচাল সে আগুনের মধ্যেই রয়ে গেল। খবরের কাগজটির বিশেষ সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে, সেই অজ্ঞাত পথচারীর নাম আলবের্তো মেনোত্তি, পেশায় ইস্কুল মাস্টার।

পূর্বদৃষ্ট প্রতিকৃতির সঙ্গে আমার বন্ধু মেনোত্তির সত্যি অনেক সাদৃশ্য ছিল, যদিও আমার সংশয় তখনো পুরোপুরি কাটেনি।

কিন্তু মানুষের স্মৃতি কী ভয়ানক পক্ষপাতিত্বে পারদর্শী! মেনোত্তিকে আমি জানতুম, আজ সে মার্টার হয়েছে, তাই আমার মনে তার যে চেহারা

সেই সকালে ভেসে উঠল তা মহাপুরুষের, সত্যি যেন মাথার চারদিকে জ্যোতি। মানুষ মেনোত্তি, জীবন্ত মেনোত্তি, যাকে আমি কাল রাত্রে জেনেছিলুম, সে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমার মনে বেঁচে রইল শুধু মৃত মেনোত্তি।

তাই স্টেশনে পৌঁছে যখন ওয়েটিং রুমে এসে শুনলুম একটি বুড়ী মনে মনে বলছে, "মেনোত্তি তোমার কাছে গেছে। Sia lodato, Jesu Cristo, oggi, sempre ;" তখন আমার মেনোত্তি সম্বন্ধে আর কোনো কথা মনে ছিল না ; শুধু ভাবছিলুম, আমি ওকে জানতুম।

প্রায় একই সময়ে কয়েকটি ছেলে যখন স্টেশনের সবায়ের হাতে স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ইস্তাহার দিয়ে গেল—যাতে লেখা আছে মেনোত্তির শেষ কথা: "আমি মরি, পার্টি বাঁচুক"—তখনো আমি শুধু ভাবছিলুম, আমি সেই মেনোত্তির বন্ধু। বীর মেনোত্তিকে আমি জানতুম।

সঙ্গে সঙ্গেই কানে আসছিল একদল ক্যাথলিক সমর্থকদের মিলিত স্তোত্র-গান। তাদেরও হাতে এখন বিরাট পোস্টার: সত্যকার ক্যাথলিক এমনি করেই পরার্থে জীবন দেয়, যেমন দিয়েছে ভক্ত মেনোত্তি। মেনোত্তিব এক রাত্রের বন্ধু আমিও তাদের গর্বে অংশীদার হতে চাইলুম মনে মনে।

পরে কাগজে দেখলুম, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট মেয়র ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, মেনোত্তি যে ইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন তার গ্রাণ্ট দ্বিগুণ কবে দেয়া হয়েছে এবং শহরের কোনো উপযুক্ত স্থানে শহীদ মেনোত্তির একটি পূর্ণাবয়ব প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে সিনিয়বা মেনোত্তি নাকি দলের সম্পাদকের কাছে বলেছেন যে, মেনোত্তি সারা জীবনই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ছিলেন এবং আসন্ন পৌর নির্বাচনে অন্য কোনো দলকে একটিও ভোট দেয়ার অর্থ মেনোত্তির পুণ্য স্মৃতির অবমাননা।

রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর এমন অপব্যবহার অন্যান্য দেশেও দেখেছি। তাই আমার বন্ধু মৃত মেনোত্তির স্মৃতি নিয়ে এই অশোভন কলহ ইটালিয়ানদের জাতিগত দোষ বলে মনে করিনি, কিন্তু ব্যাপারটা মুখে একটা তিক্ত স্বাদ রেখে গেল বৈকি।

রাজনীতির অতি উৎসাহী কর্মীরা যাই করুক, সকল সাধারণ মানুষের মনে মেনোত্তি যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, গাড়িতে উঠেই তা বুঝতে পারলুম। এখানেও সবাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সমবেদনার সঙ্গে ওই একই ব্যক্তির কথা বলছিল। শহীদ মেনোত্তির কথা।

আমি আমার জায়গায় বসে সদ্য কেনা কাগজগুলি খুলতে সময় পেলুম। একটা কাগজে দেখলুম আদ্রিয়ানা মেনোত্তির ছবি। আজকের তোলা ছবি নয়, কিছু দিন আগেকার। এবারে চিনতে কষ্ট হোলো না। পূর্ব রাত্রির নৃত্যোন্মত্তা আদ্রিয়ানার সঙ্গে এই ছবির মেয়ের অবিকল মিল। সেই ছবি দেখে সমস্ত ঘটনাটা এবার আমার মনে বীরপূজার রাজবেশ পরিহার করে ব্যক্তিগত রূপ পরিগ্রহ করল।

কাল রাতের কথা সব এলো মোর মনে।

গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। মনে পড়ল যে, মেনোত্তি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল আদ্রিয়ানাকে দেবার জন্যে, সেবাস্তিয়ানোব দোকানের ঠিকানায়। অন্যায় জেনেও, পকেট থেকে বের করে চিঠিটা খুলে আমি পড়তে থাকলুম, সহযাত্রীদের কোলাহল তখন আমার কানে স্তব্ধপ্রায়।

আদ্রিয়ানা,

আমি মিলান যাইনি। আজ রাত্রে পিয়াৎসা সান মার্কোয় তোমাকে দেখেছি সেবাস্তিয়ানোর বাহুডোরে। আমার আর কিছু বলবার নেই। লুকিয়ে তোমার উপর গুপ্তচরবৃত্তি করেছি বলে ক্ষমা করো।

আমি ধর্মের কথা বিস্মৃত হয়েছি তোমার প্রেমে পড়ে। গীর্জায় যাইনি কত বছর কে জানে!

আমার রাজনীতি নেই। ইল্ দুচের সময়েও তা নিয়ে মাতামাতি করিনি তাই সামান্য ইস্কুলমাস্টার রয়ে গেছি।

কিন্তু সব ক্ষতির উচ্ছল পূরণ ছিলে তুমি। আজ আমার জীবনের সেই সর্বশেষ সার্থকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কাল তোমার হাতে এ চিঠি যখন পৌছোবে তখন তোমাকে বিব্রত করবার জন্য আমি আর এ পৃথিবীতে থাকব না।

ভীরু আমি আত্মহত্যা করলুম। ইতি—

আলবের্তো

একজন জর্মান সহযাত্রী ছিলেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গম্ভীর স্বরে বললেন, "সেণ্টদের কথা বইয়ে পড়েছিলুম শুধু। জানতুম না বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে আমার নিজেরই জীবনে এমন মহান আত্মোৎসর্গ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হব। মেনোত্তির আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে!".

আমি বললুম, "তা ঠিক।"

অপর সহযাত্রী ইটালিয়ান। তিনি আমার কাগজটা কেড়ে নিয়ে তাইতে আদ্রিয়ানার ছবির দিকে তাকিয়ে উদ্বেল কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, "আমি ভাবছি সিনিয়রা মেনোত্তির কথা। আজ সকালে সভায় গিয়েছিলুম। কিছু

বলতে পারলেন না, কিন্তু সে কান্না আমি জীবনে ভুলতে পারব না। বলতে পারেন, এই পতিসর্বস্বা আদ্রিয়ানার বাকি জীবন কাটবে কী অসহ্য বেদনায়?"

আমি বললুম, "তা ঠিক।"

আমার হাতে তখনো হাস্যাস্পদ ব্যর্থপ্রেমিক আলবের্তো মেনোত্তির শেষ চিঠিটা ছিল। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে সেটাকে চলন্ত ট্রেনের বাইরে ফেলে দিলুম।

কারো প্রয়োজন নেই তুচ্ছ অনুভূতির ওই তুচ্ছ সাক্ষ্যে। বছরের পর বছর শহীদ মেনোত্তির প্রস্তরমূর্তির পায়ে পূজো দিক ক্যাথলিক চার্চ, কম্যুনিস্ট পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা—আর পতিপ্রাণা আদ্রিয়ানা।

ইটালিয়ান সহযাত্রী আবার সোচ্ছ্বাসে বললেন, 'Vive Signor Menotti!"

আমি মনে মনে বললুম, "M. Menotti est mort."

# আকাশবাণী

আমি ম্যালথস-বিশ্বাসী। আমার বন্ধু নরেনের চেয়েও বেশি। আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় নানা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ও বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য করে প্রকৃতির এই সব প্রজননপ্রতিষেধের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। কলেজ ছেড়ে চাকরি পাওয়ারও পরে আমি আমার বিশ্বাস বিসর্জন দিই নি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের সঙ্গে ক্ষীয়মাণ খাদ্যোৎপাদন ও বর্ধমান জনোৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল নিয়ে তর্ক করেছি, তর্কে ক্লান্ত হলে অসৌজন্য সত্ত্বেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছি। বিবাহে সম্মতি দিই নি।

বেরিয়ে গিয়ে নরেনের বাড়ি গিয়েছি। সেখানে সঙ্গেরও অভাব ছিল না, আতিথ্যেরও না। বেন্টিংক স্ট্রীটে অবাঙালীবেষ্টিত নিবালা সেই চারতলার ঘরটিতে নরেন আর আমি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত একটি আলাদা বিশ্ব রচনা করেছিলুম। চায়ের আয়োজন ছিল, বেতের ঝুড়িতে ডিম ছিল, ছোট আলমারিতে রুটি ছিল। তার উপর ঘরে ঘড়ির বালাই ছিল না। অতএব, নরেনের নীড়ে আমার প্রবেশ যেমন অবাধ ছিল, অবস্থিতিও তেমনি দীর্ঘ ছিল। একবার গল্প শুরু হলে কখন শেষ হোতো তার ঠিক ছিল না।

নরেনের ঘরে অন্যতর আকর্ষণ ছিল তার রেডিওটি। আমাদের আলাপ বেতারের অনুষ্ঠানে কখনও ব্যাহত হোতো না। গীতশ্রীরা গান গেয়ে যেতেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক সরল বিষয়কে জটিল করে তুলতেন,

অর্থমন্ত্রী বাংলার তরুণদের উদ্দেশে বাণী দিয়ে যেতেন, বেতার-নাটকে যাত্রার অভিনেতারা তারস্বরে চিৎকার করতেন। আমরা কর্ণপাতও করতুম না, কদাচিৎ খুব ভালো কিছু না হলে—যেমন নিরঞ্জন মজুমদারের বক্তৃতা, বা কণিকা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তবু রেডিওটা খোলা থাকত সর্বক্ষণ। ওটার শব্দ যেন সিনেমার মৃদু আবহসঙ্গীত। কথার বা কাজের বাধা নয়, বরং সহায়ক। গৎ-এর পিছনে যেন মিড়।

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেলে নরেন বলত, "আজ বরং এইখানেই থেকে যাও। কাল ভোরে চা খেয়ে চলে যাবে।"

আমি বলতুম, "না। তাহলে অফিস যেতে বড় দেরি হয়ে যায়। চলি এখন।"

বিদায় নিতে আমার ভালো লাগতো না, বিদায় দিতে নরেনের। আমি ছাড়া নরেনের সঙ্গী ছিল না, নরেন ছাড়া আমার। আমি ঘর থেকে বেরুলেই নরেন রেডিওটা একটু জোরে করে দিত, নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতা নিরসন করবার করুণ প্রয়াসে।

আর আমি? আমি বিষণ্ণ মনে ক্লান্ত চরণে আমার কলেজ স্ট্রীটের মেসে ফিরতুম। পথ চলতে চলতে পথের দু ধারের দেয়ালগুলির মধ্যে আর ছাদগুলির তলায় কী কী ঘটেছে তা মনে মনে কল্পনা করতুম। ক-কে দেখতুম খ-এর বাহুতে; আত্মহারা, বিশ্ববিস্মৃত। ঈর্ষিত হবার পূর্বেই আসন্ন গ-এর চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে উঠতুম। আবার ম্যালথসের বিভীষিকা চোখের সামনে ভেসে উঠত। বিবাহবিরোধী সংকল্প তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তর হয়ে উঠত।

যার যা খুশি করুক। আমি ওই পাপের ভাগী হব না। আগামী

দুর্ভিক্ষে আর যারই দায়িত্ব থাক্, আমি নির্দোষ। আমার বিবেক একেবারে পরিষ্কার।

কিন্তু বিবেকই তো মানুষের সবটা নয়। বিপদ সেই বৃহৎ বাকিটা নিয়ে।

আর এইখানেই কলকাতার নাগরিক দৈন্যটা সবচেয়ে প্রকট। ভদ্র অকৃতদারের অবসরযাপনের সুযোগ এই শহরে এত অল্প যে প্রায় নিরুপায় হয়েই প্রায় সবাইকে বিয়ে করতে হয়। স্থায়ী আর্ট-গ্যালারি নেই, যেখানে অফিস থেকে বেবিয়ে অফুরন্ত সুন্দরেব ঝরনায় প্রতিদিন অবগাহন করে মানুষের কর্মক্লান্ত আত্মা পুনর্জীবন লাভ করতে পারে। এমন একটা সুন্দর প্রমোদোদ্যান নেই, যেখানে অলস চরণে ভ্রমণ করলেই মানুষেব সৌন্দর্যতৃষ্ণা তৃপ্ত হতে পারে। মধ্যবিত্তের জন্যে এমন কোনো অতুর্লভ নাইট ক্লাব নেই, যেখানে রুচি ও পুরো মাসেব মাইনে না বিকিয়েও সন্ধ্যাটা কাটানো সম্ভব।

কলকাতাকে অভিশাপ দিতে দিতে আমার মেসেব ঘরে ফিবে এসে আরও নিঃসঙ্গ বোধ হোতো।

নরেনের তবু একটা বেডিও আছে। মধুব হোক, কর্কশ হোক, ঘবে একটু শব্দ হয়। একেবারে একা মনে হয় না নিজেকে। কিন্তু আমাব অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে আমার কথা শুনতে হলে আমার নিজেকে কথা বলতে হয়। মাঝে মাঝে বলিও। পরক্ষণেই মনে হয়, নিজের সঙ্গে কথা কয় তো শুধু পাগলে। আমি কি তাহলে পাগল হয়ে গেছি?

সেদিন রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। দু প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা আর যখন সহ্য করতে পারলুম না তখন ঠিক করে

ফেললুম যে, নরেনের অনুরোধ আর উপেক্ষা করব না। কালই ওকে গিয়ে বলব যে, আমি মেস থেকে উঠে ওরই ঘরে থাকব বলে স্থির করেছি। জানতুম যে নরেন খুশি হবে। সে আমারই মতো একা। আমারই মতো সঙ্গভিক্ষু, কিন্তু বিবাহবিরোধী।

আমার নরেনকে প্রয়োজন, নরেনের আমাকে।

ভারতবর্ষ লোকাধিক্যের চাপে অনাহারে ম'রে যাক, এমন কোনো ব্যবস্থা না করুক যাতে মানুষ বিবাহিত না হয়েও ভদ্রভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, যাতে সুস্থ ক্ষুধার শোভন উদ্‌বায়ন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমি আর নরেন আমাদের বিশ্বাস শিথিল হতে দেব না। আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করব। আমরা পরস্পরকে সঙ্গ দেব। বাঙলা দেশের বিবাহব্যাপ্ত মরুভূমির মধ্যে আমাদের বন্ধুত্বের মরূদ্যান সদাসবুজ থাকবে। কালই নরেনকে বলব।

পরদিন গিয়ে দেখলুম, নরেন বাড়ি নেই। পর পর তিন দিন। কিছু বুঝতে পারলুম না।

কোনো সন্ধ্যায় নরেনের বাড়ি গিয়ে তাকে না পাওয়া প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। কেননা সে কোথাও যেত না, আমারই মতো। আমারই মতো বন্ধুত্বটা সে বহুজনের উপর ছড়িয়ে দিতে পারত না। আমরা হয় একা থাকতুম, নয় তো একসঙ্গে।

কী হোলো তাহলে নরেনের ?

পঞ্চম দিন আমি আমার কার্ড রেখে এলুম নরেনের দরজায়। অন্তত জানবে যে আমি এসেছিলুম।

নিঃসঙ্গ আমি আমাকে নিয়ে যেতুম এখানে ওখানে। সব ইংরেজী

ছবিগুলি দেখা হয়ে গেলে হিন্দী ছবি পর্যন্ত দেখতে যেতুম। নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে যে কোনো তৃণখণ্ড আঁকড়ে না ধরে আমার উপায় ছিল না। অতৃপ্ত সঙ্গক্ষুধার তাড়নায় আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোকানের রেডিও পর্যন্ত শুনেছি।

আমার কার্ড রেখে আসবার পরেও বেশ কয়েক দিন নরেনের কোনো খবর পাই নি। জানতুম যে সে আমার কার্ড পেয়েছে, কেননা পরে একদিন গিয়ে দেখেছিলুম কার্ডটা সেখানে ছিল না। নরেন তবু খবর দেয় নি। দেখা করে নি বলে আমার অভিমানও হয়ে থাকবে বা। আমিও আর যাই নি।

শেষে নরেন এসে একদিন উপস্থিত আমার অফিসে। প্রায় তখন পাঁচটা বাজে। আমিও বেরুতে যাচ্ছিলুম। আমি যে রোজই নরেনকে আশা করতুম, সে কথা গোপন করে সাধ্যমতো নির্লিপ্ত স্বরে বললুম, "কী খবর? আমাকে মনে আছে তাহলে!"

নরেনের মুখ দেখে আমার এই মৃদু তিরস্কারও আমার নিজেরই কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হোলো। বেচারীর সংকোচের সীমা ছিল না।

কিন্তু শুধু সংকোচ নয়। আরও কী যেন বৃহৎ পরিবর্তন হয়েছে আমার বন্ধু নরেনের। নরেন সেই পরিবর্তন যথাসম্ভব লুকোবার চেষ্টা করে বললে, "কদিন আসতে পারিনি। এ-এ বাড়ি ফিরতেও একটু দেরি হয়েছে। তা—"

নরেন আমার এমন বন্ধু যে তার উপর আমি বেশিক্ষণ অভিমান করে থাকতে পারি নে। তার উপর ওকে এমন লজ্জিত ও বিব্রত দেখে ওর প্রতি আমার স্নেহ ও মায়া আরও শতগুণ বর্ধিত হোলো।

## আকাশবাণী

### পৃষ্ঠা ছয়

আমি হেসে বললুম, "তা কী হয়েছে? রোজই যে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে এমন কী কথা আছে?"

আরও একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে যোগ করলুম, "আমার যদি কাজ থাকে সন্ধ্যাবেলা, তাহলে আমিই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি?"

বললুম, কিন্তু জানতুম যে সন্ধ্যাবেলা আমার নরেনের সঙ্গে দেখা করার চাইতে কোনো কাজ কখনও বেশি জরুরী মনে হয় নি।

নরেনের কাছেও কাজের উল্লেখটা ভালো লাগল না। এই মিথ্যার আড়ালে সে আশ্রয় নিতে চাইল না। বললে, "না, কাজ নয় ঠিক, তবে—।"

নরেন আর বলতে পারল না।

আমাদের মধ্যে কখনও কিছু লুকনো ছিল না এত দিন পর্যন্ত। কিন্তু আজ যখন দেখলুম, এমন কিছু আছে যা নরেন আমাকে বলতে নারাজ, তখন আহত হলেও তা নিয়ে বিবাদ করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কথা এড়াবার সুযোগ দেবার জন্যেই বললুম, "চলো, আমার সঙ্গে চা খাবে।"

আমরা দুজনে এত দিন এত কথা বলেছি। কিন্তু কথা কোনো দিন ফুরোয় নি। কোনো দিন মনে হয় নি, এবারে কী নিয়ে আলোচনা করব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনও বিষয় ছিল না যা নিয়ে আমরা তর্ক করতুম না।

যুদ্ধ হলে বা কোথাও ভূমিকম্প হলে তখনই দুজনে সমস্বরে প্রায় তৃপ্তির সঙ্গে বলতুম, আবার প্রকৃতি দেবী লোক-ছাঁটাইয়ের কাজে লেগেছেন।

পরিচিত কারও বিয়ের খবর পেলে দুজনে মিলে তাকে অভিশাপ দিতুম।

রাস্তায় প্রসূতিসদনের একতলা বাড়ি দোতলা হলে ইচ্ছা হোতো রাত্রে ও-বাড়িতে গিয়ে আগুন লাগাতে।

কিন্তু সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে আমাদের দুজনের সব কথা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। নরেন কী ভাবছিল সেই জানে। আমি এমন কিছু ভেবে পাচ্ছিলুম না যা বললে নরেন আরও বিব্রত হোতো না।

নিঃশব্দে, প্রায় পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে, আমরা একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলুম। রাস্তায় চলতে চলতে তবু কথা না বলবার একটু অজুহাত ছিল। এখন দুজনে মুখোমুখি বসেও যখন মুখে কথা জোগাল না, তখন অস্বস্তির আর সীমা রইল না।

আমাকেই শুরু করতে হোলো, "আচ্ছা, বাঙলা দেশের শেষ সেন্‌সাস নিয়ে তুমি যে প্রবন্ধটা আরম্ভ করেছিলে, ওটা শেষ হয়েছে ?"

এমন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নেও যে নরেন বিব্রত হবে, ভাবতে পারি নি। ইতস্তত করতে করতে বললে, "না। এই, এই—ওটা আর শেষ করে উঠতে পারি নি। বলো তো, তোমাকে রিপোর্টটা দিয়ে দিই। তুমি বরং—"

বুঝতে বাকি রইল না যে, নরেনের ও-প্রবন্ধ লিখতে আর ইচ্ছা নেই। অনুমান করলুম যে প্রশ্নটা সত্যি যতটা নৈর্ব্যক্তিক মনে করেছিলুম ততটা নৈর্ব্যক্তিক ছিল না।

আমি আবার চুপ করে রইলুম। খঞ্জ আলাপটাকে বার বার বাজে কথার লাঠির উপর ভর করিয়ে চালাতে আর ভালো লাগছিল না।

কিছুক্ষণ পরে নরেন বললে, "তারপর তোমার আর খবর কী ? কী করলে সন্ধ্যায় এই কদিন ?"

"বিশেষ কিছু নয়। তোমার খোঁজে গেছি। না পেয়ে পথে পথে একা একা ঘুরেছি। কী জানো, রেডিও শোনাটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই কোনো দোকানের সামনে দাঁড়িয়েও মাঝে মাঝে—"

নরেন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "ও, হ্যাঁ। আমি বলতে যাচ্ছিলুম কথাটা। আমি বলি কি, রেডিওটা বরং তুমি নিয়ে যাও। আমার আর ভালো লাগে না ওটা শুনতে। মানে—"

রেডিওটা আমায় দিলে সত্যি দুঃখিত হতাম না। কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে অমন উপহার নিতে আমার দ্বিধা ছিল। বললুম, "সে কী কথা? তোমার রেডিও আমি কেন নিতে যাব? সন্ধ্যায় না হোক, পরে বাড়ি ফিরে তুমি শোন নিশ্চয়ই। চলন্ত রেডিও ছাড়া তোমার ঘর যে বোবা মনে হবে!"

নরেনের সঙ্কোচ তখনও কাটে নি।

তবু বললে, "না ভাই, ফিরে এসেও আর শুনি না। তখন ওই গোলমাল আর ভালো লাগে না। বেডিওটা তুমিই নিয়ে যাও।"

আমি তবু আপত্তি জানিয়ে বললুম, "তা হোক। কিছুদিন পরে আবার তোমার ওটার দরকার হতে পারে। রেডিও অত নাড়াচাড়া করতে নেই। খারাপ হয়ে যেতে পারে।"

লক্ষ্য করছিলুম যে নরেন একটু পরে-পরেই তার ঘড়ি দেখছিল। যেন এখনই উঠতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কোথাও যেন উপস্থিত থাকতে হবে।

নরেন আমার কথার উত্তরে বললে, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। রেডিও আর আমার দরকার হবে না। কাল তুমি ওটাকে তোমার মেসে নিয়ে যাও। আমি সার্ ফিলিপ সিডনি : ইওর নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।"

নরেন একটু হাসল। কিন্তু আমি সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলুম না।

গত কয়েক দিন শুধু অনিশ্চিতভাবে আশঙ্কা করেছিলুম যে হয়তো আগের বন্ধু আমি হারাতে বসেছি। এখন জানলুম যে আমার আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

বন্ধু হারালে রেডিওটা আরও বেশি কাজে আসবে। তাই নরেনের অনুরোধে রাজী হয়ে গেলুম। বললুম, "কাল সন্ধ্যায় তাহলে তোমার ঘর থেকে নিয়ে যাব? না কি আজই ফেরবার পথে—?"

নরেন আবার বিব্রত হয়ে বললে, "না ভাই, আজ নয়। আজ আমায় একটু বাদেই উঠতে হবে।" আবার সে ঘড়ি দেখল। "কালও সন্ধ্যায় বোধ হয় অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরা হবে না। কিন্তু তোমার আসার দরকার কী? আমি নিজেই লোক দিয়ে রেডিওটা তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ।"

আমাদের সম্বন্ধটা এমন নয়, অন্তত ছিল না, যে কোনো কিছুর জন্যে কেউ কাউকে লৌকিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ দেব। অন্য সময় হলে আমিও কথাটা বলতুম না, আর বললে নরেনও আমার উপর রাগ করত।

কিন্তু আজ আমার কথা সে প্রায় শুনলই না। একটু পরেই উঠে বললে, "আচ্ছা ভাই, এখন আমাকে উঠতেই হবে। আবার দেখা হবে।"

আমি চায়ের দোকানে বসেই দেখলুম যে নরেন ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল। নিশ্চয়ই আমি ওকে দেরি করিয়ে দিয়েছি।

ট্যাক্সি মিলিয়ে গেল।

সেই সঙ্গে আমার সর্বশেষ বন্ধু।

বাংলা-সাহিত্যে স্বামীহারার বেদনা, ব্যর্থ প্রেমিকের আর্তনাদ, সন্তান-হারার বিলাপ আছে। কিন্তু বন্ধু-হারানোর ব্যথার কোনো সার্থক সাহিত্যিক

দৃষ্টান্ত স্মরণ করতে পারি নে। যেখানে ম্যালথসের মুখে ছাই দিয়ে আজও বাল্যবিবাহ প্রচলিত সেখানে পরিণত বন্ধুত্বের সুযোগ নেই বলেই বোধ হয়।

যাই হোক, পরের দিন অফিস থেকে আমি সোজা আমার মেসে ফিরলুম। উদ্দেশ্যহীন পথপরিক্রমায় আর অভিরুচি ছিল না।

সেটা শনিবার। মেসের বেশির ভাগ কেরানীবাবুরা সপ্তাহান্তে দেশে গেছেন। পাঁচ দিনের আবশ্যিক নিঃসঙ্গতার পরে দু দিনের বিলাস।

আমি শুধু একা আমার ঘরে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে একটার পরে একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলুম। এর আগে অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, এবারে নরেনশূন্য নিঃসঙ্গতাও সহ্য করে নিতে হবে।

তবু বিয়ে করব না।

নরেন যে রেডিওটা দিয়ে যায় নি, এতক্ষণ সে কথা মনেই ছিল না। রাত যখন প্রায় দশটা, তখন নরেন হঠাৎ এসে হাজির। সে আলোটা জ্বালতেই আমি উঠে বসলুম।

সে তার নিজের আনন্দে এমন বিভোর হয়ে ছিল যে, আমার বিষণ্ণতা লক্ষ্যই করে নি। আপন উচ্ছলতায় প্রায় চেঁচিয়ে বললে, "দেখ, নিজেই তোমার জন্যে রেডিওটা নিয়ে এলুম। উঃ, সারাটা পথ এটাকে কোলে করে আনতে হয়েছে! নাও। কোথায় তোমার প্লাগ পয়েণ্ট? এরিয়েলটা কাল সকালে লাগিয়ে নিও। ওটা বাদেই কলকাতা বেশ ভালো শুনতে পাবে। আর্থ কনেকশনটাও কাল করে নিলে চলবে।"

বলতে বলতে নরেন নিজেই দক্ষ মিস্ত্রীর মতো সব ব্যবস্থা করছিল। আমার দিকে তাকায়ও নি।

আমি আবার প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, "এটা না আনলেই পারতে নরেন। তোমার রেডিও তোমার ঘরেই থাকা ভালো।"

নরেন এবার বসে পড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "শোনো বলি, আমি কাল বিয়ে করছি। বিয়েতে তোমাকে আসতে বলব না, কেননা বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতামত আমার অজানা নেই। তোমার মতের আমি বদল করতে পারব এমন যুক্তি আমি জানি নে। কিন্তু আমার অন্তত যুক্তিতে আর কাজ নেই।"

নরেন একটু থেমে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চোখ বুজে আপন মনে প্রায় কবিতার সুরে বলে চলল, "আর আমার নিঃসঙ্গতা নেই। জীবনের সাথীকে এবার খুঁজে পেয়েছি। একবার ইলার কথা শুনলে কণিকা মুখোপাধ্যায়ের গানও বেসুরো শোনায়। সেই সুরে যখন আমার মন ভরপুর তখন আমি নিরঞ্জন মজুমদারের বক্তৃতা শুনতে বসব কোন্ দুঃখে? এসব আর কানে তুলব না। এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার কানে শুধু আসবে ইলার কথা, ইলার কণ্ঠ। কাছে থাকলে কানে, দূরে থেকে প্রাণে। আগে মনে হোতো, দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা কেন? চারটেই কি যথেষ্ট হোতো না? এখন কি জান, তিনটে দিনকে মনে হয় তিনটে সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত!"

নরেন আরও কী বলেছিল মনে নেই। ওই প্রলাপের নিশ্চয়ই ওর কাছে অনন্ত অর্থ ছিল। কিন্তু আমার শোনবার মতো ধৈর্য ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নরেন বললে, "না ভাই, আর আমার রেডিও শোনবার সময় নেই। এটা তোমারই থাক্। চলি।"

নরেন তখনই চলে গেল।

তারপর এক মাস কেটে গেছে। নরেনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আমার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল ছিলুম। তবু নরেনের সম্বন্ধে সব কৌতূহল কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার ? মাঝে মাঝে ওর কথা ভেবেছি। আনন্দে মুখর নরেন ও ইলার ছবি মনে মনে কল্পনা করেছি।

ওদের জীবনে জায়গা কোথায় রেডিওর ?

বা রেডিওটার বর্তমান উপভোক্তার ?

আজ অফিস থেকে বেরিয়ে আবার নরেনের কথা মনে পড়ল। একবার ভাবলুম, ওর বাড়ি যাই। বেন্টিংক্ স্ট্রীটের কাছাকাছি গিয়েও ওর বাড়িতে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করলুম না।

কাজ কী ওদের স্বর্গে অনাহূত অতিথি হয়ে ?

সেখান থেকে ডান দিকে ফিরে একটা ছবি দেখতে গেলুম। তারপর বাইরেই একটা পাঞ্জাবীর দোকানে খেয়ে প্রায় দশটায় মেসে ফিরলুম।

ফিরে দেখি, দরজায় তালার সঙ্গে এক টুকরো কাগজ লাগানো। ঘরে ঢুকে আলো জেলে দেখি, ওটা নরেনের লেখা।

লিখেছে, "দেখা হোলো না। কিন্তু যদি কিছু মনে না করো, এবং তোমার যদি খুব অসুবিধা না হয়, তাহলে রেডিওটা আমি ফিরিয়ে নেব। আমাদের ওটা চাই আবার। কাল সন্ধ্যায় আমি একজন লোক পাঠিয়ে দেব।

—নরেন।"

## সংকল্পী

দীর্ঘ খেচরণের পরে ভূমিস্পর্শে যাত্রীর আপন দেহটি অস্বাভাবিক রকম লঘু বলে মনে হয়। ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে কার্ল মুনের সেকথা অজানা ছিল না। তার মনে আছে সে যখন প্রাহা থেকে আকাশপথে টুলায় নীত হয়েছিল—যাক্ সেকথা, কার্ল সেকথা মনেও আনতে চায় না আর।

দমদমে পৌঁছে কিন্তু মাটি ছুঁয়ে নিজেকে তার ভয়ানক রকম ভারী মনে হোলো। সঙ্গে জিনিসপত্র যে বেশি ছিল তা নয়,—কী করেই বা থাকবে? সেই নাৎসী পুলিস যেদিন এসে তার ঘর চড়াও করল খানাতল্লাসের অজুহাতে—থাক্, একথাও কার্ল আজ আর স্মরণ করতে চায় না।

তবু, দমদমে নেমে কার্ল যেন তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারছিল না; যেন পিছন থেকে কেউ টানছিল, যেন বুকের কোনো বোঝা প্রতি মুহূর্তে তার গতিবেগ সংযত করছিল।

কার্ল জানতো, সত্যি পিছনের কোনো টান তার ছিল না। বুঝতে চায় নি যে, সেই ছিন্নমূল অবস্থার দুঃসহ মুক্তিই তার মনের অচ্ছেদ্য বন্ধন।

ইতিপূর্বে সে "হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন" কথাটা শুনেছিল। বস্তুত, প্লেনে বসে সে ভেবে রেখেছিল যে, দমদমে নামতে কোনো কুলী (একথাটাও সে শুনেছিল) যদি তার দিকে এগিয়ে আসে তখন সে হেসে বলবে, "আই অ্যাম ট্র্যাভেলিং লাইট; উইদাউট দি হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন, য়ু নো!" তবু, ওই আগে যা বলছিলুম, কার্লের নিজেকে ভয়ানক ভারী মনে হচ্ছিল।

বিমান ঘাঁটিতে তাকে কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে কিনা কার্ল জানতো না। তবু সে আশা করেছিল যে, তার কলকাত্তায় থাকবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো একটা খবর তার জন্যে অপেক্ষা করবে। কে. এল. এম. কোম্পানীর অফিসে খবর নিতে গিয়ে সে শুধু দেখল যে পর দিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়িতে ককটেল পার্টির একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া আর কিছু নেই তার জন্যে।

এই অনধিক আতিথেয়তায় কার্ল ক্ষুন্ন হোলো না, ভারতবর্ষের প্রতি বিরূপ হোলো না, ভারতবাসী জাতিটার উপর ক্রুদ্ধ হোলো না। গত কয়েক বছরে সে শিখেছিল মানবজাতির কাছে বেশি কিছু আশা না করতে। অল্পেই তুষ্ট হতে। বিতাড়িত না হলেই নিজেকে স্বাগত বলে মনে করতে। অপমান না পেলেই নিজেকে সম্মানিত অভ্যাগত বলে জ্ঞান করত।

কার্ল তাই কারো উপর রাগ করল না। কিন্তু একান্ত অপরিচিত পরিবেশে তার নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হোলো। দমদম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিমান ঘাঁটি নয়, কিন্তু এর গঠনভঙ্গি নিঃসন্দেহে আধুনিক। অন্যান্য বিমানবন্দরের মধ্যম এই অনুকরণটি দেখে বিরক্ত হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু বিস্ময় অসম্ভব।

বিস্ময় লাগল অনতিদূরের ওই ভাঙা কুটীরগুলি দেখে। কার্ল তার য়ুরোপকে জানতো; এশিয়ায় চাকরি নেবার আগে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল প্রাচ্যের প্রাচীনতার জন্যে। কিন্তু দমদমে নেমে সে যে মিশ্রিত চিত্রের সম্মুখীন হোলো তার কাছে হার না মেনে উপায় নেই। এ যে এ-ও নয়, ও-ও নয়! বিচিত্র নয় যে, নূতন ও পুরাতনের এই বিস্ময়কর প্রতিবেশিত্বে, এশিয়া ও য়ুরোপের এই অদ্ভুত সংমিশ্রণে, নবাগত কার্ল মুন কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত বোধ করল।

অনিশ্চয়তা বাড়ল বিমান কোম্পানীর চৌরঙ্গী অফিসে এসে। এখন কোথায় যাবে কার্ল? কোন হোটেলে? দমদমে বাসের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় একটা হোটেল-তালিকা এসেছিল কার্লের হাতে। নামের সামনে হোটেলের দৈনিক দক্ষিণার হারের উল্লেখ ছিল। কিন্তু দ্রুত দেশ পরিবর্তনের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, বিভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সময়সাপেক্ষ সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ হয়ে পড়ে। ডয়শমার্কের মানে বিচার করলে, দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা কি খুব বেশি না কম? কার্ল মুন কাগজ-কলম নিয়ে হিসাব করতে বসে উৎসাহ পেল না। বিমান কোম্পানীর অফিসের নিকটতম হোটেলে গিয়ে উঠল। দরকার হয় তো পরদিন কারো সঙ্গে পরামর্শ করে আর কোথাও উঠে যাওয়া যাবে।

আপাতত বিশ্রাম করা যাক।

চিন্তাপ্রিয় লোকের পক্ষে দেহের বিশ্রাম মানেই মনের দ্বিগুণ খাটুনী। কার্লের মনে তাই নানা চিন্তা নানা কল্পনা এসে ভীড় করল। বাঙলা দেশের শ্রমিকের সঙ্গে তার কাজ, এবার সে তাই বাঙলা শিখবে। রাজনীতির সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখবে না। রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে বিরোধ সে সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে বিরোধও আবার ভদ্র যুক্তিবিনিময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, বর্বর যুদ্ধে পরিণত হয়। না, যুদ্ধে আর তার রুচি নেই। তাই সে এসেছে নিরপেক্ষ নেহরুর দেশে। এখানে সে কাজ করবে, ভাব করবে। আবার যদি কখনো য়ুরোপ বিভেদ ভুলে সভ্য হয়, তবে হয়তো কার্ল য়ুরোপে ফিরবে। নইলে ফিরবেই না।

আপাতত, শান্তি চাইলে এশিয়ায় এসো, যেমন কার্ল এসেছে। এশিয়ায় কৃষির উন্নতি করে, শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে, কোটি কোটি দরিদ্রের দুঃখ মোচন

করো। হলদে, কালো, ব্রাউন চাষীর নগ্ন পাঁজরগুলি একটু মাংস দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করো।

কার্ল শান্তিদায়ী এই সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের কল্পিত চিত্র থেকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা আহরণ করল। কিন্তু মন থেকে এই চিন্তাটা কিছুতেই দূর করতে পারল না যে, য়ুরোপের পন্থা অনুসরণ করে এশিয়াও যদি একদিন শিল্পগর্ভা হয়ে ওঠে, তবে তার পরদিন সেও হয়তো য়ুরোপের মতো যুদ্ধস্রাবী হয়ে উঠবে। সেই শিল্পের সন্ততি অস্ত্রসম্ভার ধারণ করবার জন্যে থাকবে এশিয়ার অগণ্য জনসাধারণ। য়ুরোপের সেদিন কী অবস্থা হবে?

কার্ল এ আশংকাটি আসন্ন বলে মনে করল না; কিন্তু শান্তিপূর্ণ ভারত-বর্ষে শিল্পগঠনে তার ভূমিকা যে সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত, এই মোহ আর তার রইল না। বস্তুত, পয়েন্ট ফোর বা কলম্বো প্ল্যান যদি তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যে পুরোপুরি সফল হয়, তাহলে তা কি পাশ্চাত্ত্যের আত্মহত্যারই সামিল হবে না? পূবের লোকেরা বিশ্বাস করে কী করে যে পশ্চিমের পূর্বোন্নয়নের পরিকল্পনা আন্তরিক? পূবের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়ে পশ্চিম নিশ্চিন্ত থাকবে কোন ভরসায়?

অপর পক্ষে, দারিদ্র্যজর্জর পূর্ব যদি পশ্চিমের সহায়তা ব্যতীত আপনি একদিন রাশিয়ার হাত ধরে গাত্রোত্থান করে, তবে তো তার প্রতিহিংসা-প্রবণতা আরো সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাবে।

কোমল শয্যায় শুয়ে কার্ল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না সে এশিয়ায় এসে ভালো করেছে কিনা। ভালো করলে, কার? এশিয়ার না য়ুরোপের?

মাথার উপর পাখা ঘুরছিল, কিন্তু তবু কার্ল জুন মাসের আর্দ্র গ্রীষ্মে ঘেমে উঠছিল। অবসাদে আচ্ছন্ন কার্ল উঠতে পর্যন্ত উৎসাহ পেল না, যদিও

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। কার্লের মনে হোলো যে, গোটা প্রাচ্যের সমগ্র মানবজাতিই বোধহয় এই উৎসাহশূন্য ক্লান্তির চাপে চিরকাল নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে। অবসাদক এই আবহই বোধহয় প্রাচ্যের সকল উচ্চাভিলাষের সমাধি হবে। বোধহয় সত্যি, শীতধন্য পশ্চিমের ভীত হবার কোনো কারণ নেই।

উঠে স্নান করে কার্ল বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হোলো। তিনশো তিরিশ নম্বর কামরা থেকে নেমে এসে একবার টেলিফোন করে তার নিয়োগকর্তা কোম্পানীর বড়ো সাহেবকে জানিয়ে দিল যে, সে নিরাপদে এসে পৌঁচেছে। কাল সকালে অফিসে দেখা করবে। বড়ো সাহেব, 'ওয়েলকাম টু ইণ্ডিয়া' বলে শুরু করেছিলেন, 'হ্যাভ এ গুড টাইম' বলে শেষ করলেন।

কার্ল বেরুল সন্ধ্যার চৌরঙ্গীতে। নিয়ন লাইটের আলোয় কার্ল আর কলকাতার শুভদৃষ্টি হোলো।

সে ভারতবর্ষে এসেছিল 'খোলা মন' নিয়ে, অর্থাৎ প্রায় কিছুই না জেনে। তাই কলকাতার লোকেরা শহরের যা কিছু স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে কার্লের কাছে তাও বিশেষ দ্রষ্টব্য বলে মনে হোলো। সামনের খোলা ময়দান কার্লের ভালো লাগল। কিন্তু সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে যে অসংখ্য ভিখারী ছিল তারাও তার দৃষ্টি এড়াল না। বিলাসী হোটেলের ঠিক সামনে এই বিবস্ত্র নিরন্ন ভিখারীর ভীড় আমরা কলকাতাবাসীরা আমাদের শহরের নির্জীব আসবাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করি, দ্বিতীয়বার ওদের দিকে ফিরেও তাকাইনে, কিন্তু বিদেশীর চোখে এই বৈসাদৃশ্য লুকানো থাকে না। তারা অবাক হয়, যেমন কার্ল হোলো।

কিন্তু সে জানতো যে দারিদ্র্যমোচন অশ্রুবিসর্জন দ্বারা সাধিত হয় না, বক্তৃতাবর্ষণে তো নয়ই।

একটু এগিয়ে কার্ল দু'চারজনের মুখে 'স্কুল গার্ল', 'ভার্জিন নার্স', 'নচ্ গার্ল' ইত্যাদি কথাগুলি শুনল। কিন্তু সে বিস্তর ভ্রমণ করেছে; তার অজানা নেই যে, ভিখারী যদিও সব দেশের পথে ঘাটে নেই, সব দেশেই এঁরা আছেন। এই দফায় তাই কার্ল ভারতবর্ষের প্রতি বিরূপ হোলো না।

দু'চারটে দোকানে, নেহাৎ কৌতূহলেরই বশে, দুয়েক বোতল বীয়ার খেয়ে কার্ল যখন তার হোটেলে ফিরল তখন তার ক্লান্ত মনে সমস্ত সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা নিতান্ত অস্পষ্ট, অগোছালো ও অসমঞ্জস। প্রথম দমদমে নেমে জায়গাটাকে মনে হয়েছিল ইংরেজ-ধর্ষিতা ভারতীর জারজ সন্তান বলে। এখন কলকাতার কেন্দ্র পরিদর্শন করে সেই প্রথম দর্শন যেন আরো বেশি সমর্থন পেলো।

কার্ল তবু মেনে নিল। সে য়ুরোপের আবর্ত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে, এইটেই পরম সান্ত্বনা। এখানে এমন কোনো পার্কের কাছ দিয়ে তাকে হেঁটে যেতে হবে না, যেখানে বড়ো বড়ো হরফে লেখা থাকবে: VERBOTEN. এখানে যদি সে কোনো বৈষম্যের সম্মুখীন হয়, তবে তা হবে তার স্বপক্ষে। বৈষম্য তাব পছন্দ নয়, কিন্তু তা শুধু অপরের প্রতি প্রযোজ্য হলে প্রতিবাদ মৃদু হয়। কার্ল ঘুমিয়ে পড়বার আগে আবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল যে ভারতে সে রাজনীতি করতে আসেনি।

পরদিন ব্যবস্থামতো সে নেতাজী সুভাষ রোডে গেল অফিসে রিপোর্ট করতে। বেশিক্ষণ সময় লাগল না। দু' তিনজন ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় হোলো, বাকিটা হবে সেদিনই সন্ধ্যায় পার্টিতে। কার্লকে বুঝিয়ে দেয়া

হোলো যে, তার কাজ বেশির ভাগ সময়েই থাকবে খড়্গপুরের কাছে একটা জায়গায়, সেখানে কোম্পানীর নতুন কারখানা হচ্ছে। ভয় নেই, খড়্গপুরে ভালো ক্লাব আছে। খোলা জায়গা। তাছাড়া মিডনাপোর জেমিণ্ডারির কয়েকজন সাহেবও থাকেন কাছাকাছি। কলকাতাও কাছে। তাছাড়া, এখনি অবশ্য কারখানায় যেতে হবে না। অন্তত মাসখানেক কলকাতার অফিসেই কাটাতে হবে। আজ আর অফিসে থাকবার দরকার নেই। বাকি দিনটা কার্লের ছুটি। সে ডিরেক্টরের ঠাণ্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

"মিস্টার মুন!"

কার্ল পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একটি মেয়ে তাকে ডাকছে। ডিরেক্টরদের টাইপিস্ট ওই মেয়েটি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। সুশ্রী। কার্ল দাঁড়াতেই মেয়েটি বলল, "খড়্গপুরে যাবার আগে যদি একবার আমাকে জানান দয়া করে। ওখানে আমার মা আর ছোটো বোন থাকে। ওদের জন্যে কিছু বুনে রেখেছি, আপনার হাতে পাঠাতে চাই। অবিশ্যি," মেয়েটি অনেক ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে বলল, "অবিশ্যি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন।" আরো বিনীত স্বরে চোখ নামিয়ে বলল, "কোনো কষ্ট হবে না আপনার। আমি আগে থেকে ওদের জানিয়ে দেব। ওরাই আপনার বাংলো থেকে নিয়ে যাবে।"

দমদমে কার্ল যে রসিকতা করবার সুযোগ পায়নি, এখন সুবিধা পেয়ে তাই বলল, "কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। আমি বেশি বোঝা নিয়ে ভ্রমণ করছিনে। উইদাউট দি হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন, য়ু নো। আমি নিশ্চয় যাবার আগে আপনাকে জানাব। আপনি—?"



"আমি মিস লোপেজ, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারির স্টেনোগ্রাফার। অনেক ধন্যবাদ।"

"নট অ্যাট অল" বলে কার্ল বিদায় নিল। তার আগে বলল, "আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলছিলেন বিকেলের দিকে সুইমিং ক্লাবে গিয়ে মেম্বর হতে। ক্লাবটা কোথায় তাও জানিনে। তা—আপনি যদি আজ বিকালে—"

"অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মুন। কিন্তু—"

কার্ল বিব্রত বোধ করল। বোধহয় প্রথম পরিচয়েই এমন অনুরোধ এখানে অশোভন। ক্ষমা চেয়ে কার্ল চলে গেল। মিস লোপেজকে আর কিছু বলবারও সুযোগ দিল না।

সুইমিং ক্লাবে আর সেদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কার্ল অনুমোদিত পোষাক প'রে সন্ধ্যায় গেল ককটেল পার্টিতে। বড়ো মেম সাহেব এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কার্ল পর পর বহুজনের সঙ্গে অভিবাদন-বিনিময় করে একটা হুইস্কি হাতে করে এক ধারে দাঁড়াল। এর মধ্যে আবার কে একজন অতিথি এলে আবার পরিচয়ের পালা। কার্লের বড়ো সাহেব নবাগতের নাম করে বললেন, "আর, ইনি আমাদেব খড়্গপুবের নতুন প্লান্টের বয়লার এঞ্জিনিয়ার, মিস্টার কার্ল মুন।"

অতিথি হেসে বললেন, "মুন, নট মার্ক্স!"

কার্ল না হেসে বলল, "কার্ল, নট গ্রাউচো।"

অতিথি আবার হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা কাষ্ঠহাসির মতো শোনাল।

মোদ্দা কথা, কার্লের ওই রসিকতাটা ভালো লাগেনি। সত্য বলতে কি, ওই পার্টির কোনো কিছুই কার্লের মনঃপূত হয়নি। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক মিলনেই অল্পাধিক কৃত্রিমতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় সমবেত অতিথিদের মধ্যে কার্লের যেন নিজেকে বড়ো বেশি আড়ষ্ট বলে মনে হচ্ছিল। যেন সে পথ ভুলে কোন গুপ্ত সমিতির গোপন সভায় এসে উপস্থিত হয়েছে যার বিশেষ সাংকেতিক পরিভাষা তার অজ্ঞাত। যেন সে নীচু ক্লাসের ছাত্র থেকে উঁচু ক্লাসের বড়ো ছেলেদের খেলায় যোগ দিতে এসেছে। এঁরা সবাই কার্লের আগে প্রাচ্যে এসেছেন, তাই সবাই যেন নবাগতের স্বনিযুক্ত পৃষ্ঠ-পোষক। নতুন কোন মন্ত্রে যেন এবার কার্লকে দীক্ষিত করতে হবে।

কিন্তু একটা জিনিস দেখে কার্লের বড়ো ভালো লাগল। পার্টিতে অন্তত তিন জন ভারতীয় মহিলা ছিলেন। তাঁদের একজনের মধ্যেও সামান্যতম হীনতাবোধ ছিল না, সকলের সঙ্গে তাঁরা মেলামেশা করছিলেন সমানভাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যে দু'চারটে প্রবন্ধ কার্ল কখনো কোনো কাগজে পড়েছিল, তা থেকে তার ধারণা হয়েছিল যে, শ্বেত এবং অশ্বেত সমাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এখন তার সে ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হোলো। ইংরেজরা, কার্ল ভাবল, অন্তত নাৎসীদের মতো অসহিষ্ণু নয়। সদ্য-স্বাধীন ভারতীয়দের সঙ্গে গতকালের প্রভুজাতির যদি এমন সৌহার্দ্য থাকে, তবে কেন ওই য়ুরোপীয় কাগজগুলি এমন অপপ্রচার করেছিল? আগেকার ইতিহাস কার্ল জানতো না, বর্তমান সৌহার্দ্যের কারণ নির্দেশও তার সাধ্যাতীত, তাই সে ভুল বুঝল। ইংরেজদের উদারতায় মুগ্ধ হোলো। ভাবল, অন্তত এদিক থেকে বিচার করলে য়ুরোপ থেকে পালিয়ে এসে সে বেঁচেছে।

পরদিন আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল মিস্ লোপেজের সঙ্গে

সাক্ষাতে। পূর্ব দিনের প্রত্যাখ্যানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মহিলা কার্লকে বললেন, "আজ বিকেলে আপনি কী করছেন ?"

"বিশেষ কিছু নয়। অফিস থেকে হোটেলে যাবো, তারপর—"

"আমি সাতটায় আপনার সঙ্গে হোটেলে দেখা করব। যদি আপনি অনুমতি দেন।"

"আমি অপেক্ষা করব। আমার রুম নম্বর—"

"আমি জানি।" মিস লোপেজ অন্তর্হিতা হলেন।

বারবারা লোপেজ মেয়েটি ভালো।. কিছুদিন আগেও মফঃস্বলে ছিল, পড়েছে খড়্গাপুর ইস্কুলে। বাপ সেখানে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করতো।

বারবারার মনে আছে, তার বাবা নিজেকে য়ুরোপীয় বলে মনে করতো। যদিও, কোথাও সে য়ুরোপীয় বলে গৃহীত হোতো না। সে দুষতো বারবারার মাকে, তিনি একেবারেই স্থানীয়া কন্যা। বিদেশীত্বের এই ছেলেমানুষী অভিমান বাবার মৃত্যুর সঙ্গেই ঘুচে গিয়েছিল। মিসেস লোপেজ তাঁর মেয়ে দুটিকে নিয়ে ফিরিঙ্গির অবশ্যম্ভাবী নিঃসঙ্গতায় বাস করতেন বিনা প্রতিবাদে। ভারতীয় সমাজে ওদের আদর ছিল না, সাহেবদের সমাজেও ঠাঁই ছিল না। দু'পক্ষেরই চোখ ছিল সুন্দরী দুটি বোনের উপর, কিন্তু বারবারা বা ক্যাথলিন কেউই প্রশ্রয় পায়নি ওই রকমের সাময়িক অন্তরঙ্গতায়। ওদের বাবা মাকে অমন দিনরাত্রি দুষতেন বলেই বোধহয় মিসেস লোপেজের মন এমন কঠোর হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি তাঁর মেয়েদের অন্যান্য ফিরিঙ্গি ছোকরাদের সঙ্গেও মিশতে দিতেন না। মৃদুতম প্ররোচনায় জ্বলে উঠতেন সমগ্র পারিপার্শ্বিকের উপর। সহ-ফিরিঙ্গিদের বলতেন, 'ওরা একাধারে বুলিস এবং কাওয়ার্ডস: সাহেবদের

পদলেহন করে, আর সুযোগ পেলে ভারতীয়দের ভয় দেখায়। খবরদার, কখনো ওদের ছায়া মাড়াবিনে।'

সাহেবরা কী করল? মিসেস লোপেজ আরো রেগে বলতেন, "আপন পিতৃপুরুষের দুষ্কৃতির প্রকাশ্য স্বীকারের সাহস নেই ওদের। ভেবেছে দু'চারটে কালিম্পং হোমস করলে আর রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে দুটো চাকরি দিলেই সব পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল! একদল ব্যবসায়ী যেমন ভাবে যে চুরি করে জালিয়াতি করে বুড়ো বয়সে দুটো ধর্মশালা করে দিলেই ভগবানকে যথেষ্ট ঘুষ দেয়া হোলো! আর, এখন তো আমরা আছি মেম সাহেবরা দেশে গেলে সাহেবদের নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে ধন্য হতে। দি ডার্টি বীস্টস্—আর আমাদের লজ্জার কোনো বালাই-ই নেই।" মিসেস লোপেজ এর পরে থুথু ফেলতেন সশব্দে ও সজোরে। সেই নিষ্ঠীবনের প্রতি বিন্দুতে সিন্ধু পরিমাণ ঘৃণা ছিল।

ভারতীয়দের জন্যে সঞ্চিত ছিল মিসেস লোপেজের ঘনতম ঘৃণা। "ওরা সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞার যোগ্য। প্রতি ব্যাপারে ওরা সাহেবদের নকল করবে; কাজে, শিক্ষায়, কথায়, ব্যবহারে, বেশে, পানে, আহারে, সব কিছুতে। দে আর দি ওয়ার্স্ট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানস। তবু ওদের জন্ম ধুতি আর শাড়ির মিলনে, তাই নিয়ে গর্বের শেষ নেই! আমাদের তবু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান না হয়ে উপায় ছিল না, কিন্তু ওরা ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হবে, তারপর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের দেখে নাক উঁচু করবে, এটা সব চেয়ে অসহ্য! আমাদের দেশ নেই, জাত নেই। না থাক। কিন্তু কনগ্রেসীরা স্বরাজ পেলেও ওই বাবুদের সঙ্গে কোনো লোপেজ কখনো ভাব করবে না।"

পৃষ্ঠা বারো

মিসেস লোপেজ তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত তিক্ততা এমনিভাবে ব্যক্ত করতেন তাঁর কন্যাদ্বয়ের কাছে দিনের পর দিন। মেয়েরা মার হিংস্র তিক্ততা পায়নি, কিন্তু চারদিকের তিনটি সম্প্রদায়কেই গভীর সন্দেহের সঙ্গে দেখতে ও এড়াতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

বারবারা যে কার্ল মুনের সঙ্গে মাতৃদত্ত সতর্কতা ও প্রতিরোধের সঙ্গে ব্যবহার করেনি, তার কারণ কার্ল ইংরেজ নয়।

তা নয়, তবে কী সে?

বারবারা সেদিনই রাত্রে প্রিন্সেস থেকে বেরুবার সময় মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল। রাত তখন একটা বেজে গেছে। কার্ল ট্যাক্সি নিয়েছিল বারবারাকে পৌছে দিতে তার পার্ক স্ট্রীটের কোন বোর্ডিং হাউসে। কড়া আইন আছে ক্যাথলিকদের ওসব ওয়ার্কিং গার্লস' হোমসে। এমনিতেই ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবু, ট্যাক্সি থেকে নেমে জেলখানায় প্রবেশ করবার আগে বারবারা সরাসরি প্রশ্ন এড়িয়ে সুকৌশলে বলেছিল, "কার্ল, তোমাকে তোমার ভাষায় 'গুড্ বাই' বলব। কী বলব বলো।"

কার্ল ধরা দেয়নি। কণ্ঠে একটু তরল প্রণয়ের স্বর এনে বলেছিল, "এমন কোনো ভাষা নেই যাতে তোমার কণ্ঠে 'গুড বাই' আমার কানে মধু বর্ষণ করবে। তার চেয়ে সভ্য মানুষের একমাত্র ভাষায় বলো, 'অ রাভোয়া'।"

একটু থেমে, বারবারা কিছু বলবার আগেই, যোগ করেছিল, "তার আগে বলো, কাল তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? কখন?"

বারবারা মুহূর্তের জন্যে এই প্রত্যক্ষ প্রেমনিবেদনে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে তার মার ভীষণা মূর্তি ভেসে উঠল। তবু স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করতে বাধল। বলল, "পরে বলব।"

"পরে কেন?" কার্ল জানতে চাইল।

"বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন চলি, কার্ল।" বারবারার কণ্ঠে যে করুণ আন্তরিকতার আমেজ ছিল তা কার্লকে স্পর্শ করল।

কিন্তু সেই সুরই তো সব বেদনার উৎস। রূঢ় হলে কার্ল মুহূর্তে বুঝে নিতো—'বলিতে হোতো না কোনো কথা'। কিন্তু প্রত্যাখ্যান যেখানে এমন গভীর বেদনার সঙ্গে জানানো হয়, যেন অনুরোধ না রাখতে পেরে কার্লের চেয়ে বারবারাব ব্যথাই বেশি, সেখানে স্বভাবতই প্রত্যাখ্যাতেব' মনে এই প্রীতিদায়ী সন্দেহ বাসা বাঁধে যে বাধাটা তাহলে অন্তরেব নয়, বাইরেব। অন্তরের বাধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বৃথা, আবেদন নিবর্থক। মানুষ তা নীরবে সহ্য করে, মেনে নেয়। নির্বিবাদে মানা শক্ত বাইবের বাধা। সে বাধার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করলে শুধু প্রেমের পরাজয় ঘটে না, পৌরুষেব অবমাননা হয়। জোরে 'না' বললে কার্ল বিনাবাক্যব্যয়ে বারবারাকে ছেড়ে চলে আসতো। আস্তে, যেন নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, 'না' বলাতে কার্লকে আবার বলতেই হোলো, "না, বারবারা, এখনি বলো। কী এমন কথা যা বলতে রাত ভোর হয়ে যাবে?"

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ দিয়ে সেই মধুর সন্ধ্যাটির সমাপ্তি ঘটাতে বারবারার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কার্ল যে ছাড়বে না! বারবারা তাই রুদ্ধ-নিশ্বাসে তার শেষ কথা বলে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে সেই মেরি'স হোমের দরজা খুলে ভিতরে ছুটে গেল।

কার্লের সময় লাগল বারবারার কথাগুলির পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে।

ফিরবার পথে একা ট্যাক্সিতে বসে কার্ল মনে মনে বারবারার কথাগুলি বারবার উচ্চারণ করতে থাকল: 'আমি ফিরিঙ্গি, কার্ল, আর তুমি য়ুরোপীয়ন। আমাদের বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ।'

য়ুরোপীয়ন! কথাটা কার্ল প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে ঘুরে মরেছে। কই, কেউ তো কোথাও তাকে য়ুরোপীয়ন বলে ডাকেনি। ইটালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, এমনকি ক্ষুদে বুলগেরিয়া বা রুমানিয়ায় পর্যন্ত সে বিদেশী বলে প্রথমে চিহ্নিত এবং পরে বিতাড়িত হয়েছে। জার্মানি থেকে তো আগেই পালাতে হয়েছিল। আর এই ভারতবর্ষে এসে হঠাৎ সে কী করে তার য়ুরোপীয়ন পরিচয় লাভ করল? জার্মান বা য়ীহুদী বলে কেন ঘৃণিত হোলো না? ঘরে যে য়ুরোপীয় ঐক্য শুধু কথার কথা, বা বইয়ের কথা, বাইরে সেই স্বপ্ন কী করে এক নিমেষে বাস্তব হয়ে গেল?

একবার কার্লের মনে হোলো যে, আন্তর্জাতিক সমস্যার এমন সহজ সমাধান থাকতে কেউ একথাটা এতদিন ভাবেনি কেন? সব য়ুরোপীয়ন কেন য়ুরোপ ছেড়ে প্রাচ্যে এসে এক হয়ে যায় না?

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধনিবারণের এই হাস্যকর পন্থা উদ্ভাবন করে কার্ল আত্মতৃপ্তিতে বিভোর হতে পারল না, কেননা তখনো তার চিন্তার প্রধানা নায়িকা বারবারা। ওই পোড়া য়ুরোপীয় ঐক্যই তো তাকে বারবারার সঙ্গে এক হতে দিচ্ছে না! তবু, শোবার আগে কার্ল বারবারার আপত্তিকে কিছুটা অতিরুক্ত না মনে করে পারল না। একদিন আগেই তো সে তার বড়ো সাহেবের পার্টিতে অন্তত তিনটি ভারতীয়া মহিলা দেখে এসেছে। কই,

কেউ তো তাদের অপাংক্তেয় মনে করেনি। আবার তাদের মধ্যে একজন তো একটি ইংরেজের স্ত্রী। সেই সন্ধ্যার আনুষ্ঠানিক কাঠত্বে কার্ল বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এই আন্তঃসামাজিক সৌহার্দ্যে মুগ্ধ হয়েছিল। ঘুমোবার আগে কার্ল মনে মনে স্থির করল যে পরদিন অফিসে গিয়েই সে বারবারাকে তার পার্টির অভিজ্ঞতার কথা বলে বুঝিয়ে দেবে যে, সে ভারতবর্ষে আছে—দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়; যে কলকাতার সাহেবরা অশ্বেতদের সম্বন্ধে আদৌ অসহিষ্ণু নয়; যে তার নামও মুন, মালান নয়।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হোলো না। কার্ল অফিসে এসেই জানল যে, বড়ো সাহেব তাকে সেলাম দিয়েছে। লৌকিকতম অভিবাদনের পরে সাহেব বললেন, "মুন, কাল তোমায় খড়্গপুরে যেতে হবে।"

সাহেবের আদেশের রূঢ় সংক্ষিপ্ততায় কার্ল আহত হোলো। সেদিনকার পার্টিতে কার্ল যে অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তির অতিথি হয়েছিল, অফিসে এসে এ যেন সেই লোকই নয়। এই দুদিনের মধ্যে যেন ভীষণ কোনো কলহ হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে।

কার্ল তবু আস্তে আস্তে বলল, "কিন্তু আপনিই না বলেছিলেন যে, মাসখানেক কলকাতায় থাকবার পরে আমায় খড়্গপুরে যেতে হবে?"

"মে বি আই ডিড্। কিন্তু আমি আবার ভেবে দেখেছি। এখনি যাওয়া দরকার।"

কার্ল তবু বলল, "কিন্তু আমি যে আরো কয়েক দিন কলকাতা থাকতে চাই।"

"সেইজন্যেই আমি আর চাইনে যে, তুমি কলকাতায় থাকো।" বড়ো সাহেব তাঁর বিরক্তি বা ক্রোধ কিছুই লুকোতে চেষ্টা করলেন না।

কার্ল ভেবে পেল না কী করবে। কলহে তার রুচি ছিল না। কলহের ফলাফল সম্বন্ধেও তার ভয়ের কারণ ছিল।

১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫, এই বারো বছরে তার পুরো আয়ুষ্কালের চব্বিশটা বছর অপচিত হয়েছে। বছরের শেষে ব্যবসায়ী যেমন তার আদায়ের আশাহীন পাওনাগুলি হিসাব থেকে মুছে ফেলে, কার্লের তেমনি বারোটি বছর 'রাইট অফ' করতে হয়েছে তার জীবনের খাতা থেকে। সেই ক্ষতির পরে আজ কার্লের প্রধান কাম্য নিরাপত্তা। টেকনিক্যাল কো-অপারেশন এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কল্যাণে কার্ল ভারতবর্ষে যে চাকরি পেয়েছে, তা হঠ-কারিতার বশে হারাতে সে উৎসাহী ছিল না। কিন্তু ইংরেজ সাহেবের ঔদ্ধত্য তার আরো বেশি অসহ্য লাগছিল সুপরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক কারণে।

ন্যুরেমবার্গের বিচারের সময় কার্লের প্রিয় স্বপ্ন ছিল একটা উলট পুরাণ: চার্চিল-ট্রুম্যান-স্টালিনের বিচার হচ্ছে, জয়ী হিটলার এই বিচারের আদেশ দিয়েছেন, আসামীদের অপরাধ তারা যুদ্ধ করেছে মানবতার বিরুদ্ধে। ফেয়ারলি প্লেসে ইংরেজ বণিকের অফিসে অপমানিত কার্লের একবার মনে হোলো যে, যুদ্ধের ফল একটু এদিক-ওদিক হলে হয়তো কার্লই আজ ম্যাগ্রেগরকে বলতো খড়্গপুর যেতে। এবং হয়তো ঠিক সমান উদ্ধত স্বরে। কিন্তু সেটা স্বপ্নই। কার্ল তাই অত্যন্ত সংযত মস্তিষ্কে বলল, "বেশ, কালই আমি খড়্গপুর যাব।"

ম্যাগ্রেগর আরেকটু প্রতিরোধ আশঙ্কা করেছিল। পরাভূত কার্লের নম্র সম্মতি সত্ত্বেও তাই ম্যাগ্রেগরকে এবার খুলে বলতে হোলো, "গুড্। আমি অফিসকে বলে দিয়েছি বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করতে, আর খড়্গপুরেও টেলিগ্রাম চলে গেছে। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, তবে—"

ম্যাগ্রেগর একটু থামলেন। কার্ল ইঙ্গিতটার তাৎপর্য বুঝল না। অপেক্ষা করল।

পরে সাহেবই ব্যাখ্যা করলেন, "তবে, খড়্গপুরেও য়ুরোপীয়নদের একটু সাবধান হয়ে চলতে হয়। ওখানে বি. এন. আর-এর একটা বড়ো কারখানা ছিল, আর তার চারিদিকে নানা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পল্লী গড়ে উঠেছিল। এখনো ওরা অনেকেই ওখানে রয়ে গেছে। আমার অবশ্য একটুও কালার-প্রেজুডিস নেই ( কার্লের বুঝতে বাকি ছিল না, আছে ), তাছাড়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আমি আদৌ অবজ্ঞা করিনে ( অর্থাৎ করি ), আই ডেয়ার সে ওদের মধ্যেও ভালো লোক আছে ( অর্থাৎ নেই ), তবে কিনা য়ুরোপীয়নদের সঙ্গে ওদের প্রকাশ্য সংস্পর্শে উভয় সম্প্রদায়েরই অমঙ্গল হতে আমি একাধিক-বার নিজেই দেখেছি। তাই—"

কার্লের বুঝতে বাকি রইল না যে, গত রাত্রির প্রিন্সেসে যাবার খবব সাহেবের কানে পৌঁছোতে বাকি থাকেনি। বারবারা বিদায় নেবার আগে কেন কেঁদেছিল, কার্ল এবারে তাও বুঝতে পাবল। পদচ্যুতির ভয় এখনো কার্লের কণ্ঠরোধ্ করল, তবু সে না বলে পারল না, "বুঝেছি, কিন্তু আমি সেদিন আপনার পার্টিতে তিনজন ভারতীয় মহিলা দেখে ভেবেছিলুম যে, ওসব সংকীর্ণতা বুঝি আর—"

"আমাকে একেবারে ভুল বুঝেছ কার্ল। আমি ভারতীয়দের কথা বল-ছিলুম না, আমি শুধু ওই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে একটু—"

"তা বুঝেছি, কিন্তু ওই দুই সম্প্রদায়ের কাছে আসার ফলেই তো ওই ফিরিঙ্গিদের উৎপত্তি, তাই নয় ?"

এই সহজ কার্যকারণের কথা ম্যাগ্রেগরেরও অজানা ছিল না, কিন্তু

কথাটার এমন নির্লজ্জ উল্লেখ তার ভালো লাগল না। সে বলল, "ওটা হচ্ছে লজিক ; কিন্তু তোমরা তো জানো, আমরা বৃটিশ জাতি লজিক মেনে চলিনে। হা—হা।"

এমন আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ম্যাগ্রেগর কথাগুলি বলছিল যেন অযৌক্তিক হবার মধ্যে কোনো গৌরব নিহিত আছে। কিন্তু সে-ও বুঝতে পারছিল যে, তর্কশাস্ত্রে তার অধিকার অপ্রচুর। তাই তর্কের শেষ করে বলল, "আসল কথাটা বলি, আমাদের কোম্পানীর একটা অলঙ্ঘ্য আইন এই যে, আমাদের কোনো য়ুরোপীয়ন এ্যাসিস্ট্যান্টকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে দেখা যেতে পারবে না।"

কার্ল আইনের কথায় যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হলো। আইন দেখিয়ে কি কাজ করা যায়? না, কাজ করানো যায়? আর, আইনের কথাই যদি বলো, কই, তার কণ্ট্রাক্টে তো এমন কোনো কথা নেই যে, তার বান্ধবী-নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকতে পারবে না?

কার্ল চুপ করে থাকায় ম্যাগ্রেগরকেই আবার শুরু করতে হোলো, এবারে স্বরটা শুভাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টার, "কী জানো কার্ল, রাজনীতিতে আমি টোরি নই। লিবারেল। কিন্তু বাস্তববিস্মৃত উদারতা মূর্খতারই নামান্তর। বর্ণবৈষম্য আমি তোমারই মতো ঘৃণা করি। হয়তো তার চেয়েও বেশি। আমিও যখন বিশ বছর আগে প্রথম এদেশে এসেছিলুম, তখন এত শত বাধানিষেধে আমিও ঠিক এমনি বিরক্ত হয়েছিলুম। পরে ভেবে দেখেছি। দেখেছিও অনেক।"

অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে সঙ্কীর্ণতার সমর্থনের সঙ্গে কার্লের পরিচয় ছিল। সবল, আত্মতৃপ্ত, স্ফীতোদর, পুষ্টদেহ, সংশয়মুক্ত, আত্মবিশ্বাসী এই সব

ব্যবসায়ীদের ঠিক দার্শনিকের ভূমিকায় মানায় না। কিন্তু ম্যাগ্রেগরের শেষ কথাগুলি প্ল্যাটিট্যুড হলেও কার্লের কানে ঠিক ততটা পুরানো বা বিশ্রী শোনাল না, কেননা, প্রচলিত পদ্ধতির পায়ে তার আত্মসমর্পণের কাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশে কিছুটা আন্তরিকতা ছিল।

বিরতির পরে ম্যাগ্রেগর আবার বলল, "সেদিন পেগি ক্লাব থেকে 'কিমোনো' না কী একটা উপন্যাস এনেছিল। প্রথম কয়েক পাতা পড়েই দেখি একটি প্রাচ্যাভিজ্ঞতাসম্পন্ন চরিত্র বলছে, 'Keep the breed pure, be it white, black, or yellow. Bastard races cannot flourish. They are a waste of Nature.' পড়ে ভালো লাগল না কথাগুলি। কিন্তু হেসে উড়িয়েও দিতে পারলুম না। এদেশে আসবার আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছিলুম। দেখেছি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালে, এমনকি তার পরেও বেশ কিছুদিন, আমাদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। আমরা ওদের বাড়ি গেছি বিয়ে দেখতে বা পূজো বা নাচ দেখতে। ওরাও আমাদের বাড়ি এসেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারপর কী হোলো? বিচ্ছেদ ঘটল কি শুধু আমাদের দোষে? না কি শুধু হিন্দুদের ম্লেচ্ছবিদ্বেষে? কোনোটাই পুরো ব্যাখ্যা নয়। ব্যবধান রচিত হয়েছে ইতিহাসের আজ্ঞায়, দু-চারজন বদ্‌মেজাজী সাহেবের ইচ্ছায় বা দশ-বারোজন শুচিবাইগ্রস্ত হিন্দুর জন্যে নয়। অন্যথা হবার উপায় ছিল না। অল্পসংখ্যক লোককে যদি বৃহৎ কোনো গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য রক্ষা করতে হয়, তাহলে তা বন্ধুত্বের দ্বারা সাধ্য নয়। মনে তো আছে, প্রথম মহাযুদ্ধে আমরা তখন ফ্রান্সে। গড়খাইর এপার থেকে ওপারের জর্মানদের দিকে আমরা সিগারেট ছুঁড়ে দিতুম। ওই ভয়ানক যুদ্ধের মধ্যেও দুপক্ষে সেখানে

কী এক অচ্ছেদ্য ঐক্য ছিল। কিন্তু এখানে অবস্থা একেবারে বিপরীত। এখানে—"

কার্ল বাধা না দিয়ে পারল না। বলল, "কিন্তু এখন তো আর তার প্রয়োজন নেই। এখন তো আধিপত্যের অবসান হয়েছে।"

"তা হয়েছে হয়তো। হয়তো কেন, বোধ হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার কথা শেষ করতে দাওনি। আমি যে দূরত্বের কথা বলছিলুম, তা শুধু আধিপত্যের জন্যেই অপরিহার্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যেও। সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যদি কোনো সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সম্মানিত হয়ে বাঁচতে হয়, তবে তার উদার হবার উপায় থাকে না। নর্মানরা আমাদের দেশে এসে আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিল? আর্যরা এদেশে এসে অনার্যদের ঘৃণা না করলে তারা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো না? মুসলমানরা যদি উঠতে বসতে হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে না দিতো যে, হিন্দু থাকার অনেক জ্বালা, তাহলে ভারতের বিশাল হিন্দু সমাজ কি তাদের গ্রাস করে ফেলত না? ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা যদি শূদ্রদের অস্পৃশ্য করে না রাখতো তবে তাদের আলাদা অস্তিত্ব থাকতো কি? না, কার্ল, তোমরাও য়ুরোপে তা করোনি: হিটলারের এই নালিশটা অন্তত পুরোপুরি মিথ্যা ছিল না। আমি ব্রাহ্মণ বা ইহুদীদের দোষ দিইনে; আমাদেরও কেউ দোষ দিলে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারি না। মেজরিটি-পরিবেষ্টিত মাইনরিটির এ ছাড়া উপায় নেই, তা সে মাইনরিটির ধর্ম বা রঙ বা জাত যাই হোক না কেন। আমি—"

এমন সময় ম্যাগ্রেগরের টেলিফোনটা বেজে ওঠায় কথায় ছেদ পড়ল। ম্যাগ্রেগর ব্যস্ত মানুষ, এতক্ষণ বাজে কথা বলে অনেকটা সময় নষ্ট করে

ফেলেছে। টেলিফোনের ডাকে সে যেন আবার কর্তব্যের আহ্বান শুনতে পেল। টেলিফোন তুলে উত্তর না দিয়ে ডান হাতে মাউথপিসটা চেপে কার্লকে বলল, "আচ্ছা আবার দেখা হবে। খড়্গপুরে গ্রিফিথস তোমার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। ভালো লোক। বোধ হয়, একটু বেশি ভালো। আর সবাই তাকে হেড অব দি ফ্যাক্টরি বলে। ওটা ভুল। আমি বলি হার্ট অব দি ফ্যাক্টরি। হা—হা—। আচ্ছা। অল দি বেস্ট !"

যথারীতি করমর্দনের পরে কার্ল বিদায় নিল। ম্যাগ্রেগরের তিক্ত বক্তৃতার পরে আর তার বারবারার সঙ্গে দেখা করবার উৎসাহ ছিল না। এতক্ষণে সে বুঝল, কাল রাত্রে বারবারা কেন কেঁদেছিল, কেন সে তার আগের দিন সুইমিং ক্লাবে যেতে চায়নি।

অফিসে নিজের ঘরে ফিরে কার্ল কিছুক্ষণ দু-চারটে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করল। বিশেষ কিছু করবার ছিল না। বসতে পারবার আগেই তাকে আবার চলতে বলা হয়েছে। বসে বসে কার্লের মনে হোলো যে, সেই দিনই খড়্গাপুরে চলে যেতে পারলে ভালো হোতো। আরো একটা অসহ্য দিন এই কলকাতায় কাটাতে হোতো না।

একটু পরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বারবারা ঘরে ঢুকল। সে কার্লের টিকিট ইত্যাদি দিতে এসেছে। অতএব, বলা বাহুল্য, কিছুই তার অজানা ছিল না। কার্ল দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, "সো, ছাট'স ছাট।"

"আমি জানতুম, কার্ল, যে এইরকম কিছু হবে। কে জানে, বোধ হয় দুজনেরই ভালোর জন্যে।" এটুকু বলেই বারবারার খেয়াল হোলো যে, তারা অফিসে, যে তাকে এখনি ফিরে যেতে হবে। সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। একটু দাঁড়াল। কার্ল ডাকল না। বাধা দিল না। বারবারা চলে গেল।

একা বসে কার্ল ভাবতে লাগল। বারবারার কথা ততটা নয়, যতটা ম্যাগ্রেগরের কথাগুলি। অভিজ্ঞ ম্যাগ্রেগরের যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত। তবু ব্যক্তিকে ব্যক্তি বলে কাছে না এনে কোনো লেবেলওয়ালা সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যে কী যেন একটা অমানুষিকতা আছে। এ যেন শুধু অপরকে অপমান করা নয়, নিজের মনুষ্যত্বই যেন এতে খাটো হয়ে যায়। বারবারাকে কোনোই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি, তবু কার্লের কেবলি মনে হতে থাকল যে, সে কাপুরুষের মতো বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। আপন সুবিধার জন্যে, চাকরি হারাবার ভয়ে, সে যেন নির্দয়ভাবে বারবারাকে বর্জন করেছে।

ভালো লাগল না নিজেব সম্বন্ধে এই রূঢ় কথাগুলি ভাবতে, কিন্তু চিন্তা-গুলি মন থেকে দূব করতেও পারল না। সেদিন অফিস থেকে বেরুবার আগে কার্ল শুধু বারবারাকে বলে এল যে, পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে বারবারার মার জন্যে জিনিসগুলি খড়্গপুর নিয়ে গিয়ে ঠিক পৌঁছে দেবে। সে হোটেলে থাকবে না, কিন্তু বারাবারা যেন বেয়ারার কাছে প্যাকেটটা রেখে আসে, উপরে ঠিকানা লিখে।

বারবারা যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়েছিল। কার্ল যথারীতি বলেছিল যে ধন্যবাদে প্রয়োজন নেই।

এর পরে আর ওদের কলকাতায় দেখা হয়নি।

খড়্গপুরে এসেই কার্ল কারখানার কাজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল যে, মিসেস লোপেজের কাছে সেই প্যাকেট আর পৌঁছে দেয়া হয়নি। আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু ভেবেছিল সময় করে নিজেই যাবে।

পনের দিন এমনি কেটে গেল। বেশি ভদ্রতা করতে গিয়ে না জেনে দ্বিগুণ অভদ্রতা করল।

পরে একদিন মিসেস লোপেজ নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। কার্ল তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে মিসেস লোপেজের চিঠি পেল: "বার-বারার চিঠি অনুযায়ী আমার প্যাকেটটা নিতে এসেছিলুম। আপনার চাকরের কাছে ওটা রেখে দিলে আমি আগামী শনিবার আবার এসে নিয়ে যাব। ইতি। (মিসেস) সি. লোপেজ। পুনশ্চঃ আপনি যেন দয়া করে আমার বাড়ি আসবার কষ্ট করবেন না। আমি নিজেই আসব।"

বাড়ি যেতে নিষেধের মধ্যে কার্ল একটু মৃদু তিরস্কার আবিষ্কার করল। অন্যায়ও নয়, সত্যি তো সে দেরি করেছে। তাই সে সেদিনই সন্ধ্যায় মিসেস লোপেজের বাড়ি গেল। বাইরের গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল—মিসেস্ লোপেজ নয়, মিস্ লোপেজ। স্বয়ং বারবারা।

"আরে, বারবারা যে!"

বারবারা সবিস্ময়ে এবং তার চেয়েও বেশি সভয়ে বলল, "কার্ল? মা তোমাকে আসতে বারণ করেন নি?"

"করেছিলেন, কিন্তু আমি তো জানতুম না যে, তুমি—"

কার্ল তার কথা শেষ করতে পারবার আগেই দূর বারান্দা থেকে মিসেস লোপেজের কর্কশ ডাক এলো, "বারবারা!"

আর দ্বিতীয় কথা না বলে বারবারা তৎক্ষণাৎ ছোটো বাগানের সরু পথ ধরে বাড়ির পিছনে পালিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে, যেন কেউ তাড়া করেছে। পলায়িতা হরিণী যখন বাড়ির একেবারে পিছনে রান্নাঘরের কাছাকাছি চলে এসেছিল, তখনো তার কান ছিল বাইরের দরজার দিকে। কার্লকে অপ-

মানিত হতে হবে, বারবারা তাই ভয় করছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সমান ভয় ছিল যে, তার মা কার্লকে দেখে মুগ্ধ হবেন, ( যেমন বারবারা নিজে হয়েছিল ) এবং কার্লকে তিনি আবার আসতে বলবেন। তখন আবার শুরু হবে, কী শুরু হবে কে জানে !

কিন্তু বারবারা শুনছিল :

"আমি তো লিখে এসেছিলুম যে, আপনাকে আসতে হবে না। আমি—"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি—"

"কিন্তু আমি নয়। সবাইকে আমি জানি। টপ টু বটম, কাউকে আমার জানতে বাকি নেই। কোনো না কোনো সময় ওদের সবাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।"

"কিন্তু আমি—"

"কিন্তু আমি নয়। আমি জানি কেন আপনি বা আপনাদের মতো লোক এখানে আসেন। আসেন শুধু এইজন্যে যে—"

"কিন্তু আমি—"

"কিন্তু আমি নয়। সব আমার জানা আছে।"

এবারে কার্ল আব তার অসহায় 'কিন্তু আমি' পর্যন্ত বলতে পারল না। কার্ল এমন রূঢ়তাব সঙ্গে অপরিচিত নয়, কিন্তু দুয়ে প্রভেদ আছে। আগে য়ুরোপে সে যখন তাড়া খেয়েছে, তখন সে অপমান এসেছে ক্ষমতামত্ত অপব পক্ষ থেকে। মিসেস লোপেজের অপমান আহতের ঔদ্ধত্য, দুর্বলেব অভিমান, নিজে অপমানিত হবার ভয়ে আগে থেকে আগন্তুককে অপমান করে আত্মরক্ষা।

কার্ল তাই মিসেস লোপেজের বর্বরতায় ক্রুদ্ধ হতে পারল না। বরং

করুণা হোলো। শান্ত স্বরে বলল, "মিসেস লোপেজ, কেন জানিনে, কিন্তু এখন আপনি বড়ো উত্তেজিত রয়েছেন। আমার উপর অন্যায় করেছেন। আমি বরং পরে একদিন আসব। সেদিন দেখবেন, আমি সত্যি অত খারাপ নই। অন্যান্য যেসব সাহেবদের দেখে আপনি গোটা শ্বেতকায় জাতির উপর বিরূপ হয়ে আছেন, তারা যে আমার উপরও সমান বিরূপ! ভালো মজা, ওরাও আমায় নেবে না, আপনিও আমায় তাড়িয়ে দেবেন। ভালো!"

কার্লের করুণ হাসি মিসেস লোপেজের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি বললেন, "আমার বেয়াদবি মাপ করবেন। ফিরিঙ্গী হয়ে আপনার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার কী করে করতে পারলুম, নিজেই বুঝে উঠতে পারছিনে। আমি—আমি কয়েক দিন থেকে ভয়ানক ক্লান্ত। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ি। তাই, তাই আবার সেই পুরানো যন্ত্রণাটা যেন—।"

মিসেস লোপেজ হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে বারান্দায় যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেখানেই বসে পড়লেন। একবার বোধ হয় বারবারাকেও ডাকলেন, কিন্তু সে এত ক্ষীণকণ্ঠে যে, সে ডাক বোধ হয় তাঁর কন্যার কানে পৌছোল না।

কার্ল যখন মিসেস লোপেজকে ধরে তুলতে এলো, তখন দেরি হয়ে গেছে। বারবারা এসে কার্লের দিকে এমন ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে তাকাল যে, কার্লের নিজেরও মনে হোলো সে অপরাধী। সে দৃষ্টি ভুলতে কার্লের অনেক দিন লাগবে। তার চেয়েও অবিস্মরণীয় ছিল মিসেস লোপেজের অন্তিম দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতেও ক্ষমা ছিল না। ঘৃণা ছিল। ভয় ছিল।

কার্ল তার পরে চেষ্টা করেছে বারবারাকে তার আন্তরিক সমবেদনা জানাতে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে অকৃত অপরাধের জন্যে। বারবারা কোনো

চিঠির জবাব দেয়নি। একবারও দরজা খুলে দেখা করে নি। এমনি করে কেটে গেল প্রায় পনের দিন। বারবারার মনে সান্ত্বনাহীন, প্রতিকারহীন ব্যথার বোঝা। কার্লের মনে আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিষ্ক্রিয় নিমিত্ত হবার ব্যথা। দু'জনেরই, বেদনা হোলো দ্বিগুণ ভারী, কেননা যার যার বোঝা নিঃসঙ্গ একাকিত্বে বহন করতে হচ্ছিল।

কিন্তু মৃত্যু নিরুত্তর, তাই তার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক অসম্ভব। মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। যারা পিছনে পড়ে রইল, তাদের আবার জীবনের সূত্র তুলে নিতে হয়, আবার ঠিক আগেরই মতো বাঁচতে হয়, যেন কোথাও কিছু হয় নি। সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত মৃতের প্রতি ঘোর অবমাননা বলে মনে হয়, কিন্তু উপায় কী তা ছাড়া? বারবারাকে আবার তাই বেরুতে হোলো। সে স্থির করেছে খড়্গপুরের বাড়িটা বিক্রী করে দিয়ে আবার সে কলকাতার হস্টেলে থেকে চাকরি করবে।

কার্ল এ ক'দিন বারবারাব কাছে আসতে পায় নি, কিন্তু খবর নিয়েছে রোজ। প্রথম সুযোগেই সে তাই বারবারার সঙ্গে দেখা করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, "শাস্তি তো দিয়েছ। এবাবে জানতে পাব কি অপরাধটা কী?"

বারবারা উত্তর এড়িয়ে বলল, "দোষ আমার ভাগ্যের। তোমার অপরাধ কী?"

"বিশ্বাস করো। সত্যি আমি সেদিন তোমার মাকে এমন কিছু বলি নি, যাতে তিনি উত্তেজিত হতে পারেন। বরং—"

"না কার্ল, মিথ্যে নিজেকে দোষী করছ। তোমার কিছু বলতে হবে কেন? তোমার আবির্ভাবই যথেষ্ট। কেটি যা করে গেছে তারপর আমি প্রতি মুহূর্তেই ভয় করছিলুম যে, মা এটা সহ্য করতে পারবেন না।"

কার্ল জানতো ক্যাথলিনের কীর্তি। সে কিছুদিন আগে একটি ফিরিঙ্গী ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে চক্রধরপুরে।

বারবারা বলতে লাগল, "সেইদিনই মা আমায় টেলিগ্রাম করলেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে। এসে দেখি মা প্রায় উন্মাদিনী। কেট বিয়ে করেছে, তাই থেকে জন্ম হবে আবার কতগুলি অবাঞ্ছিত ফিরিঙ্গী সন্তানের, তাদের আবার সারাজীবন সহ্য করতে হবে সব জাতির অবজ্ঞা, আবার তারা বড়ো হয়ে প্রতি নিমেষে অভিশাপ দেবে মাকে—সারাদিন কেবল এই কথা!"

কার্ল শুনছিল। বারবারা ম্লান হাসির সঙ্গে শেষ করল, "তারপর মা'র ভয় হোলো যে, আমিও কবে এমনি কিছু করে বসব, আগাছার বীজ ছড়াব!"

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। কার্ল বিদায় নিল।

কারখানার পরে আবার পরদিন সন্ধ্যায় কার্ল এলো বারবারার বাড়ি। এমনি করে রোজ প্রায় দশ দিন। ধীরে ধীরে বন্যার জল সরে গিয়ে ডাঙার আভাস দেখা দিচ্ছিল, মৃত্যুর ছায়া সরিয়ে দিয়ে জীবনের আলো আবার হাসছিল।

কার্ল একদিন স্বত্বাধিকারীর স্বরে বলল, "তোমার কলকাতা যাওয়া হবে না।"

স্বরটা বারবারার ভালো লাগল। মনে হোলো, সত্যি সে পুরোপুরি অসহায় নয়। তবু প্রশ্ন করল, "মানে?"

"মানে আমি এখানে একা এবং কোথাও আমার কেউ নেই। তুমিও একা এবং তোমারও কোথাও কেউ নেই। অতএব,—"

অতএবটা আর বিশদভাবে বলতে হয়নি। বারবারা সেদিন হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি, অন্তত প্রকাশ্যে। অন্তরে যদিও মুখর সম্মতি চীৎকার করে উঠেছিল

তার পরের ভুলে-থাকা দিন ক'টির কথা ভুলবার নয়। কার্ল তার বড়ো সাহেবের উপদেশামৃত একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিল। বারবারাও মনে আনে নি তার মা'র সহস্র নিষেধাজ্ঞা। ওরা দু'জন সেই ক'দিন একসঙ্গে বেড়িয়েছে যেখানে খুশি, যতক্ষণ খুশি। আড়ালে কেউ যদি হেসে থাকে, তা ওরা লক্ষ্যই করেনি। ওরা দু'জনে মিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জগৎ সৃষ্টি করেছিল, যেখানে বর্ণবৈষম্য ছিল না, জাতিভেদ ছিল না। বস্তুত কোনো সমস্যাই ছিল না। অ-বিবাহের অদৃশ্য বন্ধনে ওরা ছিল মুক্ত।

প্রথম বেসুরো ঘটনা ঘটল বিয়ের তিন দিন আগে। কার্ল তার কারখানার জন্যে কর্মী নিয়োগ করছিল। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে একদল ফিরিঙ্গী ছিল। সবাই তরুণ, বয়স ষোলো থেকে তিরিশের মধ্যে। কেউ বা কালো, কেউ ফর্সা; কিন্তু সব কিছু মিলে ওই দলটার মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য কার্ল লক্ষ্য করল, যা কারো ভালো লাগতে পারে না। অনেক দিন পরে আবার তার বড়ো সাহেবের কথা মনে হোলো; এরা সত্যি বোধ হয় কামনার অপসৃষ্টি, প্রকৃতির অপচয়। এরা কোনো জাতিরই গুণগুলি পায়নি, দু'জাতিরই দোষগুলি পেয়েছে। এরা না জানে ইংরেজি, না বাঙলা। এদের না আছে কর্মক্ষমতা, না চিন্তা-মগ্নতা। এইসব হতভাগ্য ছেলেগুলিকে দেখে কার্ল তার নিজের বিবাহের সম্ভাব্য সন্তানদের কথা ভেবে শঙ্কিত হোলো।

বিয়ের আগে ওদের দেখা যেন, কার্লের মনে হোলো, মারতে যাবার পথে মড়া দেখা।

কাজের শেষে বাড়ি ফিরেও কার্লের মনে দুর্ভাবনা রয়ে গেল। কার্লের বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা বিস্তর। একটা মহাযুদ্ধ বয়ে গেছে তার জীবনের উপর দিয়ে, নুইয়ে দিয়ে গেছে উদ্ধত একটা মহাদেশকে; সেই সঙ্গে কার্লের সমবয়সী সবাইকে। জীবনের উপর ওদের মোহ তাই নিতান্ত পরিমিত। ওরা যে বেঁচে আছে, তার একমাত্র কারণ ওরা যুদ্ধে মরে যায় নি। জীবন তাই ওদের কাছে মৃত্যুর ঋণশোধের বর্ধিত মেয়াদ মাত্র। মরে গেলে দেনা একসঙ্গে শোধ হয়ে যেতো, এখন তা কিস্তিতে কিস্তিতে শুধ্‌তে হবে—জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে এইটুকু শুধু ব্যবধান, এইটুকু মাত্র প্রভেদ। এটা এমন কী একটা মহামূল্য সম্পদ, যার জন্যে আরেকজনকে—বা তার চেয়েও বেশি জনকে —এই পৃথিবীতে ডেকে আনতে হবে? সম্মতি দূরে থাক, বিনা জিজ্ঞাসায় যাকে বা যাদের আনা হবে, তারা জীবন থেকে যে এক কণা আনন্দ পাবে, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি দুঃখ পেয়ে কি কার্লকে সাবাক্ষণ অভিশাপ দেবে না? কার্লের সমস্যা আরো গুরুত্তর। সে নিজে এক অনিকেতনিক অভাগা। বারবারার অবস্থা তার চেয়েও শোচনীয়। বিবাহের দায়িত্ব নেবার সামর্থ্য ওদের কোথায়?

কার্লের ভালো লাগছিল না এই ভাবনাগুলি। কিন্তু না ভেবেই বা করে কী? সে বেরিয়ে পড়ল। বারবাবার সঙ্গে সে সমস্যাগুলি স্থির মস্তিস্কে আলোচনা করবে। আর সত্যি, সমস্যা তো তার একার নয়। বারবারারও। সমাধানেব সন্ধান তাই দুজনের মিলিত প্রচেষ্টায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বারবারার বাড়িতে পৌছে কার্ল তার বিষণ্নতা পরিহার করে হাসতে চেষ্টা করল ঠিক ঘরে প্রবেশ করবার পূর্ব মুহূর্তে। কিন্তু ঘরে এসে দেখল, বারবারা

আরো বেশি বিরস বদনে বসে আছে। সে কার্লের চেয়েও বেশি চিন্তিত। কী তার দুশ্চিন্তা? কার্ল কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "ওই ছোট্টো মাথাটায় কী এমন বিরাট ভাবনা যে লম্বা মুখ করে বসে আছো?"

বারবারা কার্লের হাত ধরে বলল, "সত্যি মনটা মোটেই ভালো নেই। জানো কার্ল, কাল রাত্রে মাকে স্বপ্নে দেখেছি।" বারবারা থামল। তার চোখে জল।

কার্ল কী বলবে ভেবে পেল না। বারবারার মাকে সে বেশি দেখেনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সময় সে উপস্থিত ছিল, এক সময় তার মনে হয়েছিল যেন সে সেই মৃত্যুর আংশিক কারণ; কিন্তু তার বেশি জানতো না। বারবারার শোকে তাই সে বারবারার মতো কাঁদতে পারল না, যদিও কাঁদলে সে নিজেও শান্তি পেতো। প্রিয়ের দুঃখে ভাগ নিতে না পারাও দুঃখ। কার্ল চুপ করে রইল। তার সমস্যার কথা তুলতে দেরি হয়ে গেল।

বারবারা বলল, "স্বপ্নের সব কিছু মনে নেই। যা মনে আছে, তাও সব তোমায় বলতে পারব না। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব, কার্ল? মাকে দেখে মনে হোলো এ বিয়েতে তাঁর মত নেই।" বারবারা আবার কাঁদল।

কার্লের মনে পড়ল তার সাম্প্রতিক দ্বিধা। বলল, "বারবারা, তুমি আমায় বলেছ তোমার মার মতামত। আমি নিজেও ভেবে দেখেছি।"

কার্লের আর বলতে বাধছিল, তবু ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভুলের আশঙ্কা তার কণ্ঠে বল দিল। বলল, "আজো ভাবছিলুম সেই কথাই। তুমি কিছু মনে করো না, বারবারা, কিন্তু আমাদের বিয়ে সম্বন্ধে একটা কথা আজ

তোমার সঙ্গে আলোচনা করব খোলাখুলিভাবে। বলো কিছু মনে করবে না।"

"একটুও না!" বারবারা অভয় দিল, যদিও তার নিজেব মনে ভয় ছিল, কে জানে কার্ল কী বলবে।

কার্ল বলল, "দেখো বারবারা, আমার কোথাও কেউ নেই। তোমারও সেই দশা। আমাদেব জীবন আমবা একসঙ্গে কাটাব। আমরা বড়ো হয়েছি। বাইরের কে কী বলল, কোন ক্লাবে আমাদের জায়গা হোলো কি হোলো না, আমার কোন স্বজাতি আমায় জাতিচ্যুত মনে করল আর তোমার কোন স্বজাতি তোমায় জাতিত্যাগী মনে করল, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু খড়্গপুরে এই ক'দিন থেকেই দেখেছি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কী অবস্থা। দু'পক্ষের অবজ্ঞায় বেচারীরা বাড়তে পর্যন্ত পারে না। এদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আমার—"

কার্লের কথা শেষ হবার আগেই বারবাবা বলল, "কী অদ্ভুত কোইন-সিডেন্স! আমিও তো সেই কথাই বলতে চাইছিলুম, বলতে পাবছিলুম না। কাল স্বপ্নে মা আমায় যেন ভয়ানক বকছিলেন। আর কিছু মনে নেই। কিন্তু মার প্রধান ভয় যেন এই ছিল যে, তাঁব ও আমাদের যেসব অসুবিধার মধ্য দিয়ে বাঁচতে হয়েছে, আবার অন্যান্য কয়েকজনের জন্য সেই অসহ্য শাস্তির আয়োজন করা হচ্ছে।"

এত সহজে সম্মতি পেয়ে কার্ল উচ্ছ্বসিত হোলো, বলল, "তাহলে এই কথা রইল, বারবারা। তুমি আর আমি দু'জনে মিলে মুন বংশের সুখের বরাদ্দের সবটুকু শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ কবব, অজাত মুনদের অংশটুকুও, তাই এর পরের মুনরা অজাতই থাকবে। ঠিক? রাজী?"

"রাজী"। চুম্বনের শীলমোহর পড়ল সেই শপথের উপর।

তার তিন দিন পরে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। গ্রিফিথস বেস্টম্যান হোলো। তাছাড়া আর কোনো ইংরেজ ও বিয়েতে যায়নি। ফিরিঙ্গিদের কাউকে ডাকা হয়নি। বারবারা প্রথম ক্রয়েচ্ছুর কাছে তার বাড়ি বিক্রি করে কার্লের বাংলোয় উঠে এলো।

শুধু স্থানান্তর নয়। বারবারার মনে হোলো তার জন্মান্তর হয়েছে। কার্লেরও।

কার্ল বলল, "সত্যি, ভাবতেই পারিনে আমার জীবনের এত দিন তোমাকে ছাড়া কী করে কাটিয়েছি। চলো, এই শনিবার দীঘায় বেড়াতে যাব।"

"চলো কার্ল। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে। কিন্তু কলকাতা অফিসের ম্যাগ্রেগর সাহেব এখনো কিছু লেখেননি?"

কার্লের কলকাতার কথা মনে ছিল না, ম্যাগ্রেগরের কথা তো নয়ই। বারবারা কথাটা মনে না করিয়ে দিলেই ভালো হোতো। তবু দুশ্চিন্তা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে কার্ল বলল, "ম্যাগ্রেগর যদি বাজে কিছু লেখে তো তুমিই আমার পদত্যাগপত্র টাইপ করে দেবে। আমি এঞ্জিনীয়র, আমাকে ওদের দরকার আছে।"

স্বাধীন, দায়িত্বহীন কার্লের যে সাহস ও ভরসা ছিল না, এখন বারবারাকে পাশে পেয়ে সে যেন কাউকেই পরোয়া করে না। বলল, "তাছাড়া, গ্রিফিথস আমার বন্ধু, ও সব ঠিক করে দেবে।"

বারবারার সঙ্গে গ্রিফিথসের দেখা হয়েছিল। লোকটিকে বড়ো ভালো লেগেছিল তার। জাত্যভিমান নেই, কিন্তু তাই বলে অন্তরঙ্গতার আতিশয্যও

নেই। নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু সে শুধু অনিয়মের ঝামেলা এড়াতে। ফিরিঙ্গি-দের সম্বন্ধে তার লোক-দেখানো ভালোবাসা নেই, আবার অবজ্ঞাও নেই। বিয়ে করেনি, কেননা না করেও দিব্য চলে যাচ্ছিল। আবার, ওই ঝামেলা এড়াতে। কার্ল যখন তাকে নিজের বিয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল, তখন সে আপত্তি করেনি (কেননা আপত্তি বৃথা হোতো); উৎসাহও দেখায়নি, কেননা উৎসাহ বোধ করেনি; মনে মনে ভয় ছিল যে, তার স্নেহাস্পদ কার্ল হয়তো মোহমুক্ত হলে এজন্যে অনুতাপ করবে, দুঃখ পাবে। বিবাহ যদি সমস্ত পারিপার্শ্বিকের উর্ধ্বে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটা অস্তিত্ব হোতো, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু দু'দিন পরে—অকৃতদার গ্রিফিথস ভয় করছিল—নির্বান্ধব জীবনে ওরা হাঁপিয়ে উঠবে, যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে দরজা-জানালাহীন কক্ষে। তখন বারবারার মনে হবে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্মো ভয়াবহ। জাতে উঠতে গিয়ে তার একুলও গেছে ওকুলও গেছে। কার্লের মনে হবে, সামান্য একটা ম্যুলাটো মেয়ের জন্যে সে তার সারা জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তখন কী হবে?

গ্রিফিথস এসব সন্দেহ কারো কাছেই কখনো প্রকাশ করেনি। কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানে তার অনুৎসাহ গোপন থাকেনি। কার্ল অনেকবার চেষ্টা করেছে তাকে খুশি করতে, হাসাতে। কোনো না কোনো অজুহাতে গ্রিফিথস উল্লাস এড়িয়েছে।

বারবারা তাই একদিন কার্লকে না জানিয়ে গ্রিফিথসের বাড়ি গিয়ে-ছিল। অতিথি অপমানিত হয়নি, কিন্তু গৃহকর্তার অনমুমোদনও গোপন রয়নি। বারবারা অস্বস্তি বোধ করছিল, কিন্তু মুশকিল এই যে, গ্রিফিথসের

মতো লোকের উপর রাগ করা অসম্ভব। এমন লোকের নীরন্ধ্র গুডনেসের উপর বিরক্ত হওয়া যায়, কিন্তু নির্ভর না করে উপায় থাকে না। নিরুপায় হয়ে বারবারা দু'চারটে বাজে কথার পরে অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আমাদের বিয়েতে আপনার সম্মতি ছিল না, তাই নয় ?"

"আমার সম্মতি বা অসম্মতি অবান্তর।"

"তবু জানতে চাইছি।"

"আমি জানাতে চাইনে।"

"আচ্ছা, যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন কী করতে বলেন ?"

"আমার কাছে উপদেশ পাবেন না। কার্লের পত্নী হিসাবে কখনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাবেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব। ক্ষমা করবেন, আমাকে কিন্তু একটু পরেই বেরুতে হবে।"

বারবারা আর কিছু না বলে বিদায় নিয়েছিল। আজ কার্ল যখন বলল, গ্রিফিথস তার বন্ধু, সে সব ঠিক করে দেবে, বারবারা আপত্তি করল না। কিন্তু কথাটা শুনতে ভালোও লাগল না। তা-ছাড়া বারবারা জানতো যে, গ্রিফিথস সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য কার্লকে আঘাত করবে।

কার্ল হঠাৎ বলল, "চলো আজ গাড়ি করে অনেক দূরে বেড়াতে যাই। ঘরে আর ভালো লাগছে না।"

কথাটা বারবারার ভালো লাগল না। আজ ঘরে ভালো লাগছে না। কাল ঘরই ভালো লাগবে না হয়তো। তখন বারবারা কী করবে ? কী দিয়ে কার্লকে বাঁধবে ?

গত কয়েকদিন তার সেই শপথের কথা মনেই হয়নি; আজ মনে হোলো; মনে হোলো, আমার জীবনের চেয়ে আমার শপথ বড়ো নয়।

আমার মা'র মৃত্যুও আমার জীবনের চেয়ে বড়ো নয়। আমি ঘর বেঁধেছি, আমার মায়ের প্রেতাত্মা এসে সে ঘর ভেঙ্গে দেবে আর আমি কিছু করব না?

কার্ল এতক্ষণ বারবারার কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে বলল, "কী ভাবছ চুপ করে? যাবে না বেড়াতে?"

বারবারা ততক্ষণে স্থির করে ফেলেছে। শিশুর মতো হেসে উঠে কার্লের গলা জড়িয়ে সে বলল, "চলো, অনেক অনেক দূর বেড়াতে যাব আজ। সেই এরোড্রোমের কাছে অ্যামেরিকানরা সুন্দর রাস্তা করে রেখে গেছে। সেখানে গিয়ে বসব অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক দিন ভালো ছেলে হয়ে থেকেছ, আজ পুরস্কার পাবে। যাবার সময় বিলিমোরিয়ার দোকান থেকে একটা হুইস্কি নিয়ে নেব। কেমন? আমিও একটু খাবো।"

কার্ল তৎক্ষণাৎ উঠে বিলিমোরিয়ার দোকানে টেলিফোন করল। ( "না, না, পাইণ্ট নয়, কোয়ার্ট")। সেই সঙ্গেই তার মনে পড়ল গ্রিফিথসের কথা। বারবারাকে জিজ্ঞাসা করল, "গ্রিফিথসকে সঙ্গে নেয়া যাক, কী বলো?"

"প্লীজ, আজ নয়। আরেক দিন। আজ শুধু তুমি আর আমি।" বারবারা উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করল না। সোজা চলে গেল তৈরী হয়ে নিতে। তার আধ ঘণ্টা পরে তারা পথে। রাত তখন আটটা।

অনেক বেড়িয়ে তারা যখন বাড়ি ফিরেছিল, তখন রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

ভোরে প্রথম চোখ খুললে কার্ল বলল, "উঃ, কাল কী করে গাড়ি চালিয়ে ফিরেছি তা ভগবানই জানেন।"

পৃষ্ঠা ছত্রিশ

বারবারা পরম পরিতৃপ্ত হাসির সঙ্গে বলল, "আমিও জানি; কেননা আমিই গাড়ি চালিয়ে এনেছি, এবং নিরাপদে।"

"সত্যি? আমাব কিছু মনে নেই। কমপ্লিট ব্ল্যাক-আউট!"

বারবারা আরো কাছে সরে এসে বলল, "তা কী হয়েছে? সঙ্গে তো আর কেউ ছিল না। আমি ছিলুম।"

"কিন্তু—"

"নাঃ, আমায় এবার উঠতেই হবে," বলে বারবারা তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ কবে স্নানের ঘরে চলে গেল। কার্ল একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল।

বৃথা চেষ্টা। পূর্বাপরসম্বন্ধমুক্ত ওই ক'টা ঘণ্টা কার্লের স্মৃতি থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছে। জাল ফেলে তাদের ধববার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মনে আছে, কার্ল আর বারবাবা বিমান-অবতবণীর দক্ষিণে বাঁধানো একটা রাস্তার ধারে বসেছিল। ঘাসের উপর, কোনো কিছু বিছিয়ে নয়। মনে আছে, বারবাবা তাকে একটা স্যানড়ুইচ খেতে বলেছিল। কার্ল শুধু বলেছিল, 'ওয়ান থিং অ্যাট এ টাইম।' আব মনে আছে দু'একটা টুকরো কথা।

তারপব? তারপব আজ এই সকালে ঘুম থেকে ওঠা। মাঝখানে বিরাট শূন্য।

কার্লের মনে হোলো তার জীবন যেন এমন একটা বই যার শুরুটা আছে, শেষটা আছে—হাবিয়ে গেছে মাঝের কয়েকটা পাতা। মনে পড়ল যে, এই অবস্থাটা আসলে ব্রহ্মাণ্ডের পারসীক বর্ণনার ঠিক বিপরীত, সেই যাতে পৃথিবীর উপমা এমন বই যার গোড়ার পাতাগুলি ছিঁড়ে কোথায় উড়ে গেছে,

আর শেষের পাতাগুলি নিরুদ্দেশ। তাইতো এই পোড়া পৃথিবীটাকে এমন দুর্বোধ রহস্য বলে মনে হয়!

নিজের চিন্তায় ফিরে এসে কার্লের মনে হোলো তার জীবনের খাতায় দু'বার যেন দুটো দুর্ঘটনা ঘটল। একবার যুদ্ধ এসে অনেকগুলি পাতায় এক রাশ রক্ত ছড়িয়ে গেল, সেই দাগ সত্ত্বেও কষ্টের সঙ্গে লেখাগুলি পড়া যায়, যদিও তা পড়তে তার রুচি নেই। আরেকবার সে নিজের নির্বুদ্ধিতায় তার জীবনের খাতার অনেকগুলি পাতায় কালো কালির দোয়াত উল্টে দিয়েছে যেন। এবারে কিছুই পড়বার উপায় নেই।

কী হয়েছিল কাল রাত্রে?

বারবারা যখন স্নানের ঘর থেকে 'অ্যানি গেট য়োর গান' ছবির একটা গানের সুর গুনগুন করতে করতে বেরুল, তখন কার্লের নিজের বিষণ্ণতা আরো বেশি বিসদৃশ মনে হোলো।

বারবারার আনন্দের অন্ত ছিল না। এত খুশী তাকে অনেক দিন দেখা যায়নি। সে আবার এসে কার্লের পাশে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, "কী, আজ কাজে যেতে হবে না? বেশ, উঠো না এখন। আমি বিছানায় তোমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি।" আবার বারবারা নাচতে নাচতে চলে গেল। কার্ল তার বিস্মরণের তলায় সমাধিস্থ হয়ে রইল।

কী হয়েছিল কাল রাত্রে?

খাবার খেয়ে কার্ল শয্যা ছাড়ল। কাজে গেল, না গিয়ে উপায় ছিল না বলে। কী একটা অসহ্য অস্বস্তির বোঝা মনের উপর বহাল রইল সারা দিন। দুপুরে বাড়িতে খেতে এলো না। গ্রিফিথসের কাছে নিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে তারই বাড়িতে খেতে বসল। আশা, গ্রিফিথসের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

একথা সেকথার পরে কার্ল বলল, "কাল বেড়াতে গিয়েছিলুম বারবারাকে নিয়ে। ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।"

কৌতূহলশূন্য কণ্ঠে গ্রিফিথস বলল, "তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ, ভারি নির্জন ও সুন্দর জায়গাটা।"

"হ্যাঁ, আমিও গিয়েছি দুয়েক বার।"

"কিন্তু জানো টোনি, আমার কিছু মনে নেই। বড্ডো বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।"

টোনি গ্রিফিথস হাসল। ভাবল, তবে কি এত শীঘ্রই বিবাহ থেকে পলায়নের প্রয়োজন হয়েছে? বলল, "ভালো, মাঝে মাঝে অধিকন্তু ন দোষায়।"

"না, আমি আতিশয্যের জন্যে অনুতাপ করছিনে। অদ্ভুত লাগছে এই জন্যে যে, একটা কিছু মনে করতে পারছিনে। কী করেছি, কী বলেছি, এক বর্ণও মনে নেই। নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে। যেমন মনে হয় হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে পকেট থেকে কে কখন পার্সটা তুলে নিয়েছে। যদিও হয়তো, পার্সটায় বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার পকেটমার আমার কয়েকটা ঘণ্টা চুরি করে নিয়ে গেছে, জানিনে কী ছিল সেই ঘণ্টাগুলিতে!"

"সত্যি? কিন্তু বারবারাকে জিজ্ঞেস করো না। তার নিশ্চয়ই মনে আছে। না কি সেও—?"

"না, না, ও বিশেষ খায়নি। ও-ই গাড়ি চালিয়ে এসেছে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করলে ও যে শুধু হাসে, গুন গুন করে গান গায়। আর কিছু বলে না।"

"কী গান?"

"কে জানে, ওই আনি গেট য়োর গান না কী যেন! প্রশ্ন করলে উত্তরই দেয় না। হাসে।"

গ্রিফিথস মাংসের টুকরোটা মুখে দেবার আগে বলল, "আমি ব্যাচিলর। ওদের ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।"

কার্ল হতাশার সঙ্গে বলল, "সত্যি, এদের বোঝা পুরুষের অসাধ্য।" তারপর কার্ল কর্কশ জর্মানে কী কতকগুলি প্রবাদ আওড়াল, তা টৌনির কানে মেয়েদের কথার চেয়েও দুর্বোধ শোনাল।

বাড়ি ফিরে কার্ল দেখল বারবারা সেজেগুজে তৈরি। আবার বেড়াতে যাবে। এত সাজবার ও বেড়াবার উৎসাহ হঠাৎ এলো কোথা থেকে? যে বারবারার উপর মৃতা মিসেস লোপেজের কালো ছায়া সব সময় ব্যেপে থাকতো, আজ সেখানে এত আলো কে এনে দিলে? সেই ছায়াই বা কার্লের উপর স্থানান্তরিত হোলো কার নির্দেশে?

এমনি করে আরো দেড় মাস কেটে গেল। বারবারা কোন এক আপাত-অকারণ পুলকে উড়তে লাগল। কার্ল কী এক অজানা আশঙ্কায় উত্তরোত্তর বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হতে থাকল। পরে একদিন গ্রিফিথসেরই পরামর্শে ওরা দীঘার সমুদ্রতীরে গেল দশ দিনের ছুটিতে।

ক্রমে সন্দেহের নিরসন হোলো।

বেচারী কার্ল! ঠিক যা ভয় করেছিল, ঠিক যা এড়াবার জন্যে পণ করেছিল, শপথ করিয়েছিল—তাই ঘটল একটা মত্ত সন্ধ্যার মূঢ় অসতর্কতার জন্যে। কার্ল আরো বেশি বিমূঢ় হোলো এই জন্যে যে, তার কাছে যা অবিমিশ্র বিপর্যয় বলে মনে হচ্ছিল, অপর পক্ষের কাছে সেই একই দুর্ঘটনা অনাবিল

আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছিল। এখন কী করবে কার্ল? তার নিজের ভুলের বোঝা যদি শুধু তার নিজেকে বইতে হোতো তাহলেও বোঝা যেতো। কিন্তু এ যে অন্যকে বহন করতে হবে! সারা রাত বারবারার পাশে শুয়ে কার্ল শুধু এই কথাই ভাবছিল, কিন্তু কূলকিনারা করতে পারছিল না।

বাইরে সমুদ্র আপন মহাসঙ্গীতে মগ্ন ছিল।

বিনিদ্র রজনীর শেষে, ভোরে, কার্ল বাববারাকে বলল সমুদ্র স্নানের জন্য তৈরি হতে। তৃপ্ত, শান্ত, পাণ্ডুর হাসির সঙ্গে বারবারা বলল, "কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি। আমি আজ স্নান করব না, আমার শরীরটা ঠিক ভালো নেই। তুমি স্নান করতে যাও, আমি বাইরে বারান্দায় বসে তোমার স্নান করা দেখব।"

কার্লের অস্বস্তি লাগছিল। বাববারার দৃষ্টি থেকে দূবে যেতে পেরে তাই সে নিষ্কৃতি পেল। সমুদ্রেব ধাবে, একেবারে জল ঘেঁষে বসল। অদূরে তরঙ্গরাশির সফেন উত্থান-পতন একবার মনে হচ্ছিল তিরস্কারের গর্জন বলে, পরক্ষণে তাকেই মনে হচ্ছিল অভিনন্দনের উল্লাস।

দূর থেকে কার্ল পিছনে তাকাল বারবাবার দিকে। একবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করল, শপথে সে-ও তো স্বাক্ষর করেছিল! পরেই মনে হোলো—শর্ত মেনে ব্যবসা চলে, বাঁচা চলে কি?

কার্ল আবার দৃষ্টি ফিবিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। তাহলে বাঁচা মানে কি শুধু অযুক্তির পায়ে আত্মসমর্পণ? সে বাঁচা তো পশুর বাঁচা। কার্ল কি পশু?

কিন্তু তার আসল সমস্যা অন্য। বারবারাকে সত্যি কার্ল ভালোবাসে।

সেজন্যে সে বহু বাধা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেছে। প্রেমের মূল্য সে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অপরকে—।

কার্ল এবার ভাবল, দেখা যাক না বারবারাকে তার শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। কিন্তু কার্লের মুশকিল এই যে, সে নিষ্ঠুর হতে পারে না কারো প্রতি, এক নিজের প্রতি ছাড়া। সম্প্রতি সে বারবারাকে এমন খুসিতে উচ্ছল হতে দেখেছে যে, সেখানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দুঃখ ডেকে আনতে কার্লের প্রাণ কাঁদছিল।

শুধু উচ্ছল নয়, ঝর্ণা ইতিমধ্যে সরোবরে রূপান্তরিত হয়েছিল। সহসা বারবারা তার বয়সোচিত চপলতা পরিহার করে কী এক অপরূপ পরিতৃপ্তিতে সমাহিত হয়েছিল। সে যেন আর মুখরা প্রবাহিনী ছিল না; সে এখন শান্ত সরোবর। অস্থির সন্ধান সমাপ্ত হয়েছে, এখন তার ধ্যান প্রতীক্ষা। ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামি শেষ হয়েছে, এখন অপেক্ষা ফলের।

কার্লের বিপদ এই যে, তার মধ্যে সমান্তরাল বিবর্তন ঘটেনি। না দৈহিক, না মানসিক। সমস্ত ঘটনাটার সে বাইরের দর্শক, সক্রিয় অংশীদার নয় যেন। বারবারার মতো সে সবকিছু সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করেনি। তাই বারবারার কাছে যা প্রত্যক্ষতই আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল, কার্লের কাছে তা দুরূহ সমস্যা। সমাধান কী?

কার্ল আবার ভাবল, সে বারবারাকে তার শপথের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোলো, যদি বারবারা সহজেই রাজী হয়ে যায়? তখন বারবারা সম্বন্ধে তার কী ধারণা হবে? সেই ধারণা নিয়ে বাকি জীবন বারবারার সঙ্গে বাস করা যে আরো দুঃসহ হবে! কার্লের নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হোলো।

পৃষ্ঠা বিয়াল্লিশ

হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ এসে অসতর্ক কার্লকে ধরাশায়ী করে দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে সেই তরঙ্গ যেন কার্লের অনিশ্চয়তা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পর মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়িয়ে দূর থেকে আরেকবার বারবারাকে দেখে নিল। মনে মনে বলল, নির্বোধ অনুকম্পায় আমার প্রয়োজন নেই। বর্তমানের সামান্য নির্দয়তা এড়াতে গিয়ে আমি ভবিষ্যতের জন্য বিরাট নিষ্ঠুরতা স্তূপীকৃত করব না। আমি দুর্বলচিত্ত ফিরিঙ্গি নই, আমি দৃঢ়মনা য়ুরোপীয়ন। কোহলপ্ররোচিত কামোন্মত্ত মুহূর্তে বুদ্ধিবিচ্ছিন্ন অপরিকল্পিত আকস্মিকতার মধ্যে হবে মনুষ্যজীবনের সৃষ্টি? সে সাধনার ধন নয়? সে প্রার্থনার উত্তর নয়?

তবে সে কার্ল মুনের সন্তান নয়।

মন ঠিক কবা এক কথা। সে অনুযায়ী কাজ করা আর। কার্ল লক্ষ্য করেছে, যখনই তার মধ্যে বুদ্ধি ও আবেগের দ্বন্দ্ব হয়েছে, প্রতিবারই বুদ্ধি পরাস্ত হয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে সে যা ঠিক করে, তা হঠাৎ কোন এক দুর্বলতা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এটাকে দুর্বলতা বলতেও বাধে। দয়া কি দুর্বলতা? মমত্ববোধ কি নির্বুদ্ধিতা? অনুকম্পা কি ক্লীবতা? ভালোবাসার জন্যে, অন্যকে আঘাত দেয়া এড়াতে, কেউ যদি নিজে আহত হয়, যদি তার জন্যে বুদ্ধির নির্দেশও অমান্য করতে হয়—তাহলে কি তাকে কাপুরুষ বলতে হবে?

কার্ল ভেবে কূল পায় না। উদাসীন, উন্মত্ত, কূলহারা সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যোদয় দেখে, সূর্যাস্ত দেখে। ঢেউ গোণে, ঢেউ শোনে। উদ্ধত কোনো তরঙ্গ যখন এগিয়ে আসতে থাকে, কার্ল ভরসা পায়; মনে

হয়, দৃঢ় ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির প্রতীক ওই তরঙ্গ। পরে সেই ঢেউ যখন মায়ের কোলে শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, কার্লের মনে হয় ওই অসহায় আত্মসমর্পণ বুঝি অবশ্যম্ভাবী। আশা বিদায় নেয়।

দশ দিনের ছুটির সাত দিন কেটে গেল এই অনিশ্চয়তার গোধূলিতে। রোজ রাত্রে বারবারার পাশে শুয়ে কার্ল অজাত শিশুব স্পন্দন শোনে। অনাগত সন্তানের গীতিময় পদধ্বনি শোনে। কিন্তু তার কানে তা ভীতিময় পদাঘাতের মতো শোনায়। বাববারার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গতায় উৎসাহ থাকে না। কী এক কমনীয় ক্লান্তিতে সে আনন কামনাহীন। কার্লের আপন উদ্দামতাকে পাশবিক বলে মনে হয়। বারবাবার প্রত্যক্ষ প্রশান্তি আরো অসহ্য মনে হয়।

বারবারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আমার উপর রাগ করেছ, তাই নয়?"

কার্ল বলল, "না।"

কিন্তু এই একটা বর্ণ বলতে তার এত দেরি হয়ে গেল যে যখন তা উচ্চারিত হোলো, তখন তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার বাষ্পমাত্র ছিল না।

আবার অনুনয়ের স্বরে বারবাবা বলল, "জানো, ডার্লিং, মাঝে মাঝে আমার নিজেরই উপর রাগ হয়। এত বাগ বোধ হয় তুমিও আমার উপর করো নি।" বাববারা কেঁদে ফেলল।

"রাগ করি নি।" কার্ল বলল দাঁতে দাঁত চেপে।

বারবারা আরো একটু কাছে সরে এসে বলল, "আমায় ক্ষমা করো কার্ল।"

কার্ল বারবারার দৃষ্টি এডাল। কিন্তু তার স্বর শুনে কার্লের মনে হোলো, সত্যি যেন বারবারার প্রয়োজন নেই কার্লের ক্ষমায়। কোনো এক প্রাপ্তিতে সে পূর্ণা। আর সব যেন তুচ্ছ। কার্লও।

বারবারা তারপর আর কিছু বলে নি। পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসতে দেরি হয় নি। যে সমুদ্রের গর্জন প্রথম শুনলে মনে হয় এর কাছে কোথাও ঘুমোনো অসম্ভব, তাও দু'দিন পরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন সে কল্লোল যেন ঘুমপাড়ানী গান।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মনে নেই। অন্ধকারে হঠাৎ একবার ঘুমের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে বারবারা দেখল, বিছানায় কার্ল নেই। ঘুম ভেঙে গেল।

জোরে বাতাস বইছিল। কাছাকাছি কোথাও আলো ছিল না, কিন্তু সমুদ্রেব কালো জলে ফেনার সাদা হাসি জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। বারবারা হঠাৎ শুনল, বাইবেব বারান্দায় কে যেন কথা বলছে। কে এখন এই রাত্রে এই নির্জন সমুদ্রতীরে কার সঙ্গে কথা বলতে আসবে? কার্লই বা কোথায় গেল? কান পেতে বারবাবা যা শুনল, তা কার্লের কণ্ঠে অবোধ্য কয়েকটা জর্মান কথা। কার্ল নিজের মনে কী বলছে একা একা বাইরে দাঁড়িয়ে!

বারবারা ডাকল, "কার্ল!"

কোনো সাড়া নেই। কার্ল আপন মনে কী বলে চলেছে। আস্তে। চাপা গলায়।

ভয়ে, ভাবনায় বারবারার কণ্ঠরোধ হোলো। দ্বিতীয়বার কার্লকে ডাকতে পর্যন্ত পারল না।

দূরে সমুদ্রের গর্জন কোন উন্মাদের আর্তনাদের মতো শোনাল। না, কোন পুত্রহারা মায়ের অবিরাম বিলাপ?

বারবারা জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে রইল, গায়ের উপর চাদরটা টেনে দিল। যেন কিছু ঢেকে রাখতে হবে। যেন কিছু রক্ষা করতে হবে কোন শত্রুর

হাত থেকে। এতক্ষণ সে ভয় পেয়েছিল। এখন যেন একা থাকাই বেশি নিরাপদ মনে হোলো। কাজ নেই কার্লকে ডেকে। বারবারা তো একা নয়।

হঠাৎ বিছানার পাশের অ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে উঠল। সত্যি অ্যালার্ম। বারবারা চমকে উঠল। বারান্দা থেকে হঠাৎ কার্ল চেঁচিয়ে বলল, "কে ?"

সশব্দে দরজা খুলে কার্ল ঘরে ঢুকল। অন্ধকার। সাদা বিছানার উপর বারবারা শুয়ে। কার্ল এগিয়ে এলো। বারবারা ভয় পেয়ে বিছানার একেবারে ধারে সরে গেল। কার্ল বসল বিছানার উপর। অনেকক্ষণ তুজনের কেউ কোনো কথা বলল না। ঘড়িটার অ্যালার্ম বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু তার টিক টিক শব্দ সমুদ্রের গর্জনকেও যেন ছাপিয়ে উঠছিল।

*টিক টিক টিক টিক……*

সময় যেন চলছিল না, বুঝি বা দাঁড়িয়ে থেকে লেফট রাইট, লেফট রাইট করছিল। প্যারেডে যেমন সৈন্যদের মার্ক-টাইম করতে হয়।

*টিক টিক টিক টিক……*

আর শোনা যাচ্ছিল, বারবারার নিঃশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ। বেঁচে থাকার কথাটা তার চেয়ে জোরে ঘোষণা করা যেন নিরাপদ নয়।

কার্ল আস্তে হাত বাড়িয়ে বারবারার হাতটা ধরল। বারবারা ভরসা পেল না। ভয় পেল। তবু জিজ্ঞাসা করল, "বাইরে কার সঙ্গে কথা বলছিলে, কার্ল ?"

"বাইরে ?" কার্ল থামল। তার গলা শুনে বারবারা অবাক হয়ে গেল। এ যেন কার্লের গলা নয়। অন্ধকারে কার্লকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। অশরীরী ওই কণ্ঠ যেন তার স্বামী কার্লের নয়, যেন অন্য কোনো অপরিচিত

জগৎ থেকে অনাহূত অবাঞ্ছিত কোনো অতিথি এসে বারবারার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। বারবারা হাতটা ছাড়িয়ে নিল কার্লের হাত থেকে।

হঠাৎ কার্ল আপন মনে বলল, "ঘড়িতে কে এই সময় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল?"

বারবারা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "জানিনে তো। আমি তো দিইনি।"

"তুমিই দিয়েছ। তা নইলে মিসেস লোপেজ এমন ভয়ে ভয়ে ছুটে চলে গেলেন কেন?"

"কে চলে গেল?" বারবারা শুনেও শুনতে চাইল না।

"তোমার মা।" কার্ল বলল স্পষ্ট গলায়।

"মা?" বারবারা চেঁচিয়ে উঠল। মাতৃনামের মতো অপ্রীতিকর কিছু নেই আজ বারবারার কাছে। কিন্তু তিনি এলেন কোথা থেকে?

ভূতের গল্প শুনলে হাসি পায় দিনের বেলায়। রাত্রে, অন্ধকারে, নির্জন সমুদ্রতীরে সে কৌতুক থাকে না। বাববারা ভেবে পেল না কী করবে। হঠাৎ কার্লের সঙ্গে কেন দেখা হোলো তার মার? কার্লের কেন মনে হোলো তিনি এসেছেন? যে কার্ল ভুলেও কোনো দিন তাদের বিয়ের পরে মিসেস লোপেজের নামোল্লেখ করেনি।

বারবারা আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কার্ল সেই অদ্ভুত স্বরে বলে চলল, "আমি কথা দিয়েছিলুম। শুধু আমার নিজের কাছে নয়, তোমার মার কাছে। নিজেকে না হয় বোঝাতে পারতুম, কিন্তু মৃতের কাছে দেয়া কথা আমি ফিরিয়ে নেব কী করে? তুমিও তো কথা দিয়েছিলে, বারবারা।"

বেচারী জবাব খুঁজে পেল না। ভয়ে, ত্রাসে বলল, "আলোটা জ্বালো না, কার্ল।" নিজেই বারবারা হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা খুঁজতে চেষ্টা করল।

কার্ল তৎক্ষণাৎ জোরে বারবারার হাত চেপে ধরে বলল, "আলোর দরকার নেই, বারবারা। অনেক সময় অন্ধকারেই ভালো দেখা যায়। এখন সেই সময়।"

"কী বলছ তুমি ?"

"কিছু না, ভাবছিলুম। আচ্ছা সেদিন যে ওই কালিম্পং থেকে গ্রেহামস হোমের ছেলেগুলি এসেছিল সমুদ্র দেখতে, তাদের তুমি দেখেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কী মনে হয়েছিল ?"

"কিছু না।" বারবারা আরো সরে গেল। কার্ল সজোরে তাকে কাছে টেনে আনল। আদরে নয়।

বারবারা আবার বলল, "কী হয়েছে তোমার, কার্ল ?"

"কিছু হয়নি। কিছু হয়েছিল। ভুল হয়েছিল। এবার তার সংশোধন চাই।"

কার্লের স্বর স্বাভাবিক, যদিও স্বাভাবিকের চেয়ে গম্ভীর ও কঠোর। অনিশ্চয়তার চাঞ্চল্য আর নেই। এবার এসেছে সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা। কার্ল বারবারাকে আরো কাছে টানল।

বারবারা বলল, "কার্ল, বলো কী করব। তোমার কোন কথা আমি শুনিনি ?"

"সেই তো হয়েছে আরো বিপদ সমস্ত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার উপর।.........আমার দায়িত্ব আমি এড়াব না, বারবারা।" কার্ল বারবারাকে আরো কাছে টানল।

"বলো, আমায় কী করতে হবে।"

কার্ল কিছু বলল না। বারম্বার এই আনুগত্য ঘোষণার মধ্যে কার্ল আত্মরক্ষার ইঙ্গিত পেল। তবে কি বারবারা একা বাঁচতে চাইছে? এতক্ষণ কার্ল নিজেকে হত্যাকারী মনে করে নিজেকে ঘৃণা করেছে। এখন তার বাহুবেষ্টিত মেয়েটিকে মনে হোলো হৃদয়হীনা সন্তানহন্ত্রী বলে। এত সহজে যে অন্যকে—অন্যকে কেন, নিজের অপর অংশকে—বিসর্জন দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে রাজী, কাল সে তো কার্লকেও সমান ঔদাসীন্যে পরিত্যাগ করবে, যদি প্রয়োজন হয়।

কার্ল প্রায় চেঁচিয়ে বলল, "তুমি ক্যাথলিক। তোমার প্রার্থনা বলে নাও।"

"প্রার্থনা? প্রার্থনা কেন, কার্ল?"

"বলে নাও। বেশি সময় নেই।"

"কিসের সময় নেই, কার্ল?" বেচাবী তখনো কিছু বুঝতে পারেনি।

"তোমাব শেষ প্রার্থনা শেষ করে নাও।"

নৈরাশ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বারবারা সামান্য সাহস পেল, বলল, "কার্ল, প্লীজ, তোমার কিছু করতে হবে না। আমি কালই চলে যাব। লাহোরে আমার কাকা আছে। সে আমায় একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবে। কেউ জানবে না তোমার কথা। আমার শিশুর নামে তোমার পরিচয় থাকবে না। তোমাব কোনো দায়িত্ব থাকবে না। তোমাকে কেউ দূষবে না। আমিও দূষব না। শুধু আমায় ছেড়ে দাও।"

"তুমি দূষবে না। কিন্তু আমার নিজেকে আমি কী করব?"

"কিছু বলবে না। আমার কথা ভুলে যাবে।"

"হা—হা—হা" কার্ল পাগলের মতো হেসে উঠল। "অ্যাজ ইফ ভুলে যাওয়া সোজা। অ্যাজ ইফ আমি ভুলে গেলেই সেই সঙ্গে ফ্যাক্ট্‌টারও অস্তিত্ব

ঘুচে গেল। যেন আমি ভুলে গেলেই আমার ওই দুষ্কৃতি আর দিন দিন বাড়তে থাকবে না, যেন পরে ও বড়ো হয়ে আমাকে অভিশাপ দেবে না। যেন অভিশাপ না দিলেই আমার জীবন অভিশপ্ত হবে না।"

প্রত্যেকটা বাক্যের সঙ্গে কার্লের গলা আরো উপরে উঠছিল। "আরো ভয়ানক কথা, যেন আমি অভিশপ্ত হলেই ওই মুন আর অভিশপ্ত হবে না। যেন তুমি আমায় ক্ষমা করলেই সবাই পরে ফিরিঙ্গী মুনকে ক্ষমা করবে, আদর করে কোলে তুলে নেবে, যেন তার জীবনে আবার সমস্ত সেই দুর্ভাগ্যগুলি হবে না যা তোমার ও আমার হয়েছে।"

চীৎকারের পরে কার্ল হঠাৎ যেন দপ করে নিবে গেল। খাটের উপর বসে বারবারার হাত দুটো নিজেব গলায় ফাঁসির মতো জড়িয়ে নিয়ে খুব কাছে এসে বারবারার কানে কানে বলল, "বারবারা, তুমি আমায় ক্ষমা কবো। এমন অন্যায় করেছি যার জন্যে ক্ষমা চাওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রতিকারের মূল্য যদি শুধু আমায় দিতে হোতো, এত দিন দ্বিধা করতুম না। কিন্তু আমি এমন কাজ করেছি যার উপর এখন আর আমার হাত নেই, এখন সে আপন শক্তিতে দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। আমি অসহায় দর্শক মাত্র। কিন্তু এই অসহায় দর্শকের ভূমিকা আমার চরিত্রবিরুদ্ধ। আমি ওটা পারিনে।"

বারবারা মাতৃস্নেহে সন্দেহ-জর্জর কার্লকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। তার চোখের জল কার্লের পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। বারবারা লক্ষ্য করল, কার্লও কাঁদছিল।

কার্ল বারবারাকে শুইয়ে দিল বিছানার উপব। আস্তে আস্তে, পরম স্নেহে হাত দুটো এগিয়ে নিল বারবারার গলার দিকে। এঞ্জিনীয়রের বলিষ্ঠ কব্জির শিরাগুলি ফুলে উঠেছিল। তার চাপে আস্তে আস্তে বারবারার গলার

শিরাগুলি। এইটুকু হাত দিয়ে অনুভব করা গেল। বাকিটা দেখা গেল না। বারবারার প্রথমে মনে হয়েছিল ওটা প্রেমের আলিঙ্গন। মত পরিবর্তনের বোধ হয় আর সময় পায়নি। দু'য়ে ভয়াবহ সাদৃশ্য।

*টিক্ টিক্ টিক্……*

গ্রিফিথসের সঙ্গে সরকারী কর্তাদের ভাব ছিল। কেউ কিছু জানতে পায়নি। ম্যাগ্রেগর সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল, যে সমুদ্র স্নানের ওই দুর্ঘটনার জন্য সে অতিশয় দুঃখিত। বারবারার বোন ক্যাথলিনও একটা চিঠি লিখেছিল সমবেদনা জানিয়ে। আর কেউ কিছু লেখেনি। লেখবার মতো কেউ ছিল না দুজনের একজনেরও।

কিন্তু কার্লের আর ভারতবর্ষ ভালো লাগল না। সে কণ্ট্রাক্ট বাতিল করে দিয়ে য়ুরোপে ফিরে যেতে চাইল। কোম্পানি আপত্তি করল না।

আবার সেই দমদমে কার্ল। এবারে শুধু গ্রিফিথস এসেছিল তাকে তুলে দিতে। বিদায়ের আগে এয়ারপোর্ট রেস্তরাঁয় দুজনে বসেছিল দুটো বীয়ারের সামনে। যে কথা দু'জনেরই মনে ছিল, একজনও তা উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিল না।

সময় হয়ে এলো। বীয়ারের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে কার্ল বলল, "টোনি, অন্তত তুমি বলো, আমি অন্যায় করিনি।"

গ্রিফিথস বলল, "ফরগেট ইট্।"

কার্ল বলল, "ননসেন্স! আমি পশু নই। ফরগেটিং ইজ ইম্পসিবল। বলো, অ্যাম আই ফরগিভন?"

গ্রিফিথস শেষ পর্যন্ত কার্লের প্রশ্নের উত্তর দিল না। কার্ল শুধু যাবার

আগে বলল, "আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করিনে, তোমার ক্ষমায় কী হবে? কিন্তু যা করেছি তা না করলে নিজেকে আরো বেশি অপরাধী মনে হোতো। টোনি, অন্তত এই সান্ত্বনা রইল যে, আমার অপরাধের বোঝা বাকি জীবন আমার নিজেকে বইতে হবে, আর কাউকে নয়।"

গ্রিফিথস হেসে বলল, "বিমানে যাচ্ছ। লাগেজের লিমিট আছে। মাত্র চুরাশি পাউণ্ড নেবে!"

# বিজয়িনী

কলকাতায় কোনো টুলুস লোত্রেক সম্ভবই নয়। তাই তাঁর জন্মে কোনো মুলঁ্যা রুজের কথা ভাবিনে। কিন্তু এ শহরে একজন ডেমন রানিয়ন আবির্ভূত হোলে তেমন অবাক হবার কিছু নেই এবং সত্যি কোনো ডেমন রানিয়ন এখানে এলে তিনি ব্রডওয়ের বদলে কোন রাস্তায় বিচরণ করতেন তাঁর নানা বিচিত্র চরিত্রের সন্ধানে? কোন রেস্তরাঁয় তাঁর স্থায়ী আস্তানা হোতো?

এমন হাইপথেটিক্যাল প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর আমি জানিনে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ডেমন রানিয়নের বিচরণের রাস্তা হোতো পার্ক স্ট্রিট আর তাঁর বসবার জায়গা হোতো ওই রাস্তারই উপব এথীনিয়া কাফে। এ দোকানটা পুরোপুরি সম্ভ্রান্ত নয়, কেননা আমি ওখানে মাঝে মাঝে যাই। পুরোপুরি অভদ্রও নয়, কেননা আমি আবার অনেক দিন যাইনে। কিন্তু ডেমন রানিয়ন যে কারণে সে দোকানে নিশ্চয়ই যেতেন, তা হচ্ছে এই যে সপ্তাহের কয়েকটা দিন সেখানে রেসের জকি ও ট্রেনারের ভিড় অনিবার্য।

এ দোকানের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় দশ বছরের। দেখেছি শনিবার ঘোড়দৌড় থাকলে ওখানে বুধবার হ্যাণ্ডিক্যাপ বেরুবার পর থেকে ভিড় শুরু হয় এবং শনিবার রেস শেষ হওয়ার পর পর্যন্ত ভিড় বজায় থাকে। জকিরা আসে, ট্রেনাররা আসে, আর আসে ঘোড়দৌড়ের পাণ্টাররা। শনিবার বিকেল পর্যন্ত আলোচনা চলে এই নিয়ে যে কোন কোন ঘোড়া জিতবে,

সেদিন সন্ধ্যায় আলোচনা চলে এই নিয়ে যে কী কী কারণে ওরা জিতল না। রেসে জিতলে এথীনিয়ায় আসতে হয় আনন্দ বর্ধন করতে, হারলে আসতে হয় হারার দুঃখ সুরায় ডুবিয়ে দিতে।

হাসি-কান্নার এই নাটকের আমি কৌতূহলী দর্শক। যদিও ঘোড়া সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনে এবং জানতেও চাইনে। যে দুয়েকবার কলকাতার, বা দার্জিলিঙের, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছি, সে শুধু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মজা দেখতে; ছোটো বোনের সঙ্গে যেমন দুয়েকবার সার্কাসে গেছি।

অনর্জিত অর্থে আমার লোভ নেই এমন দাবী করব না, কিন্তু ভাগ্য যে নেই, তা নিশ্চিত জানি। অন্তত এই-মরীচিকার পশ্চাতে তাই কখনো ধাবন করিনে। যাঁরা করেন তাঁদের নিন্দা করিনে, এমনকি শুধু এ কারণে তাঁদের আমার নিজের চাইতে অধঃপতিতও মনে করিনে, বরং কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঙ্গে তাঁদের দুর্মর আশাবাদিতা লক্ষ্য করে জীবনেব অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের জন্য শিক্ষা আহরণ করতে চেষ্টা করি।

সে শিক্ষা পাইনে, কিন্তু তবু আমার কৌতূহলের সীমা নেই এথীনিয়ার এই জনতা সম্বন্ধে। ওদের কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনিনে, ওবাও কেউ আমায় চেনে না, কিন্তু কান পেতে ওদের কথা শুনতে শুনতে আজ জানি কে ডেভিস, কে অ্যাডলি, কে পীকক্—এবং কে কবে সবচেয়ে বেশি জয়ী ঘোড়া চড়েছে। প্রত্যেক শনিবার সেখানে একজন করে 'হিরো' হয়, সেদিন সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। তিনি দুটো কি তিনটে কি চারটে 'উইনার রাইড' করেছেন। আমার মতো অশ্বাজ্ঞের পক্ষেও এই বীরকে সনাক্ত করা আদৌ শক্ত ছিল না। পরে আরো সহজ হয়েছে।

কিন্তু আগের কথা আগে।

পৃষ্ঠা তিন

বছর দুয়েক আগেকার কথা। নভেম্বর মাস। উইণ্টার মীটিং চলছে। তাই নিয়ে এথীনিয়া সরগরম। শনিবার। কোথাও আর টেবিল রাখবার জায়গা নেই, কোনো টেবিলে জায়গা নেই আরেকটা গেলাস রাখবার। ভয়ানক গোলমাল নেই, কিন্তু এতজনের মিলিত গুঞ্জনের যোগফল নিশ্চয়ই নৈঃশব্দ্য নয়। বেয়ারারা এদিক থেকে ওদিকে ও ওদিক থেকে এদিকে যাওয়া আসা করতে করতে ঘেমে উঠেছে। পায়ীদের মধ্যে কেউ অধৈর্য হয়ে চিৎকার করছে—বেয়ারা! বাইরের একটা কাগজওয়ালা এসেছে ব্লিৎস, কারেণ্ট, সাণ্ডে স্ট্যাণ্ডার্ড, স্ক্রীন, ইত্যাদি কাগজ বিক্রি করতে। এক কোণে কুঞ্চিতকেশ মালিক বসে আছেন তাঁর টেবিলে। তার একটু দূরে বসে আছে সেই বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ ইংরেজটি: সঙ্গে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে, যাকে প্রেমের বশে (হায়রে, এখন মনে হয় মোহবশে!) বিয়ে করে সে তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল করেছে! তার পাশের টেবিলে এক শিখ, একা একা মদ খায় আর আপন মনে হাসে। তারপর আছেন সেই বৃদ্ধ উকীল ভদ্রলোক, এমন সন্ন্যাসীজনোচিত নির্লিপ্ত মগুপ আমি দেখিনি—চোখ খুলে একবার কোনো দিকে তাকান না। তারপর ওই সিলভিয়াকে ঘিরে আছে কয়েকটি মধ্যবয়স্ক ভারতীয়, আর সিলভিয়া যথারীতি তারস্বরে বলছে সে এমন উদারহৃদয়া যে ভারতীয়দের সঙ্গে সৌহার্দ্যে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। ওইদিকে রয়েছে একটি বাচাল পাঞ্জাবী, কোথায় বুঝি একটা হেয়ার-কাটিং স্যালুন আছে। একেবারে দেয়াল ঘেঁষে, ঘড়িটার তলায়, রয়েছে কলকাতার জকিকুল আর তাদের অনুরাগীরা।

দক্ষিণের দেয়ালের বিরাট আয়নার সামনে বসে আছে একটি নিরীহ ফিরিঙ্গি যুবতী। বেচারী দৃশ্যতই এমন পরিবেশে অনভ্যস্ত। সামনের

আয়নায় নিজেকে দেখবার লোভ আছে, কিন্তু দেখলে আরো বেশি আত্ম-সচেতন হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে তার চেয়েও অপ্রস্তুত একটি ফিরিঙ্গি যুবক,—চকচকে চুল, মুখে নির্বোধ হাসি। দাঁতের মধ্যে একটা আবার সোনা দিয়ে বাঁধানো।

আমি বসেছিলুম আমার অভ্যস্ত কোণে। অহম্-এর অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে আমি তখন বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে সহনশীল ও কৌতূহলী।

ঈষৎ পানান্তে মেয়েটি তাব সঙ্গীকে হেসে বলল, "দেখলে তো, রেসিং সম্বন্ধে আমি তোমার চেয়ে কত বেশি জ্ঞানি? তোমার তিন দিনের ঘর্মাক্ত হিসাব-নিকাশের ফল কোথায় উড়ে গেল ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয়। অথচ টেবলের তিনটে বেসে আমার তিনটে ঘোড়াই এলো। তা নইলে তো বাড়ি ফিরতে হোতো পায়ে হেঁটে। এথীনিয়ায় বসে বীয়ারও খেতে পেতে না, বাড়ি গিয়ে এক গেলাস জল খেতে হোতো!"

মেয়েটি সশব্দে খিল খিল করে হাসছিল, ছেলেমানুষী হাসি।

তার সঙ্গী বেচারী আপন পরাজয়ে এমনিতেই নিরতিশয় বিমর্ষ হয়েছিল। সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াতে সে আরো আহত হোলো। বলল, "জিতেছো বটে, কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, রেসিং সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো। অমন ভাগ্য একবার হয়, দু'বাব নয়। ঘোড়দৌড় অত সোজা নয়।"

"তাই নাকি? তবে কাজ নেই আমার শিখে অত দুরূহ তত্ত্ব সব ঘোড়ার মা-বাবার চোদ্দ পুরুষের হিসাব করবার পরেও যদি তোমার মতো প্রতি শনিবার হারতে হয়, তার চেয়ে আমার কিছু না জেনে জিতে আসা অনেক ভালো।"

মেয়েটির উদ্দেশ্য সত্যি বোধহয় কথা শোনানো ছিল না। সে শুধু নিজের অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তিতে এত আনন্দিত হয়েছিল যে, কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ব্যাগ থেকে এক তাড়া নোট বের করে সস্নেহে তার উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "এসো আরেকটা বীয়ার খাও। বেয়ারা, ওর এক বীয়ার!"

সঙ্গী অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে এই দান গ্রহণ করল, পান করল, কিন্তু সে বারবার বলছিল, "চলো, জুন, এবার বাড়ি যাই। তোমার নেশা হয়ে গেছে। চলো উঠি, এর পর আর উঠতে পারবে না।"

জুন কিন্তু একটার পর একটা শেরি খেয়েই চলছিল। চোখ দুটো ততক্ষণে আরো বড়ো হয়েছে। সোনালী চুলের কিছুটা ডানচোখে এসে পড়েছে, তবু সরাবার উৎসাহ নেই। আয়নায় তাকাবার লজ্জাও ততক্ষণে বহুল পরিমাণে কেটে গেছে। হাতের সিগারেটের ধোঁয়া তার মুখের চারদিকে কুয়াশা বিস্তার করেছে। যেন শাদা মেঘের কোলে একটি সুন্দরীর মুখ ভেসে আছে। আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছিল। বোধহয় জুনেরও।

ওদিকের টেবিলের একজন জকিরও ওই রকম কিছু মনে হয়ে থাকবে। সে উঠে এসে জুনের সঙ্গে আলাপ করতে চাইল, "গুড ইভনিং, আজ রেসে গিয়েছিলেন বুঝি?"

জুন মহানন্দে ব্যাগটা দেখিয়ে বলল, "গিয়েছিলুম মানে? জিতে এসেছি। একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে ঘোড়া ধরেছি শুধু একটিমাত্র পাঁচ টাকার ট্রেবল টিকিটে—আর তিনটেই জিতেছে!"

জকি কিছুক্ষণ আগে থেকেই জুনকে লক্ষ্য করে থাকবে। তার কথাও

হয়তো শুনে থাকবে। কেননা সে যখন জুনের ঘোষণায় বিস্ময় প্রকাশ করল তা আমার কাছে অন্তত অত্যন্ত কপট মনে হোলো। কিন্তু জুনের বোধহয় তা বোঝবার মতো অবস্থা ছিল না। সে মহা উৎসাহে তার নতুন পরিচিতকে তার জয়ের কথা বলতে লাগল। জকি তখন যথোচিত সমারোহে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাদমোয়াজেল, আমার নাম জন্। আজকের ট্রেবলের তিনটে জয়ী ঘোড়াই আমি চড়েছি।"

"সত্যি ?"

জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ আজ জুনের কী সৌভাগ্য যে শুধু সে ট্রেবলই জেতেনি, আজকের রেসের সবচেয়ে সফল জকির সঙ্গেও তার দেখা হয়ে গেল ! জুন তার সঙ্গীর সঙ্গে জনের পরিচয় করিয়ে দিল। আবার বেয়ারারকে চেঁচিয়ে বলল, "ঔর এক শেরি, ঔর এক বীয়ার !" জনকে জিজ্ঞাসা করল, "প্লীজ, হোয়াট আর যু হ্যাভিং ? যু মাস্ট হ্যাভ এ ড্রিংক উইথ মি, যু মাস্ট, যু—" দ্বিতীয় বার পরের কথাটা হয়ে গেল—"মাশ্‌ট্‌ !"

জন ব্র্যাণ্ডি চাইল। সবাই 'চীয়ারস' বলে শুরু করবার পরে গেলাস নামালে জন জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আগেও জিতেছি, কিন্তু এমন পুরস্কার আগে কোনো দিন পাইনি।"

জুন জড়ানো কণ্ঠে বলল, "আপনি জানেন না আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কী খুশি হয়েছি। বলুন, আর আপনাকে কী পুরস্কার দিতে পারি ?"

জুনের সঙ্গী জনের মতো জকির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে ধন্য হবার কথা। এমন সুযোগ সে ভিক্ষা করে নিতো, যদি পরের শনিবারের

কোনো টিপ্‌স্‌ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় তার জনের জন্যে বিষম ক্রোধ ছাড়া আর কোনো অনুভূতি ছিল বলে মনে হোলো না। তারপর জুনের দ্ব্যর্থবোধক পুরস্কার-প্রতিশ্রুতিতে সে আরো অপ্রীত হয়েছে। জুনকে নিয়ে যাবার শেষ চেষ্টা করে বেচারী বলল, "আমি উঠছি। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওঠো, চলো।"

জুন চেঁচিয়ে উত্তর দিল, "ওঠো, চলো, মাই ফুট্‌! তোমার যেতে হয় যাও। আমি এখানে থাকছি। আই অ্যাম উইথ দি উইনার টু-নাইট, য়ু উইল টেইক মি হোম জন ডিয়ার, ওন্ট য়ু?" জুন তার একটা হাত জনের সবল হাতের উপর রাখল। কোমল হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সবল হাত জানিয়ে দিল যে, অমন অনুরোধ সে রক্ষা না করে কিছুতেই পারবে না।

পরাস্ত সঙ্গী অযথা বাক্যব্যয় না করে বিদায় নিল। সে করুণ দৃশ্যে আমি অন্য যে কোনো সময় অভিভূত হতুম। হয়তো জুনের সঙ্গীটি বাঙলা জানলে তাকে বলতুম, "বন্ধু, আমি র'ব নিষ্ফলের, হতাশের দলে!"

কিন্তু সে সন্ধ্যায় জুনের কীর্তি প্রত্যক্ষ করবার লোভ জয় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি একটা কাগজ পড়বার ভান করছিলুম, কিন্তু কান ছিল জন আর জুনের দিকে। চোখও কখনো তন্মুখীন হয়নি, এমন কথা শপথ করে বলতে পারব না।

জন বলল, "এবার তুমি আমার সঙ্গে একটা শেরি খাবে।"

জুন বলল, "না, না, সে হতেই পারে না। আমি তোমারই জন্যে আজ এতগুলি টাকা পেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে আর একটা ব্র্যাণ্ডি খাবে।"

কী মীমাংসা হয়েছিল মনে নেই। মনে আছে দশটার কিছু আগে জন জুনকে নিয়ে এথীনিয়া থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মনে আছে জুনের সাধ্য

ছিল না কারো উপর ভর না দিয়ে স্বাধীনভাবে হাঁটবার; মনে আছে জন সানন্দে তাকে সাহায্য করেছিল—যথাসাধ্য, যথাযোগ্য, বোধহয় তার চেয়েও একটু বেশি। মনে আছে, বেরুবার আগে জন তার সহ-জকিদের দিকে চোখের ইশারায় জানিয়ে গিয়েছিল তার পরবর্তী কার্যপরিকল্পনার অনুমেয় একটা আভাস। জকিরা সহযোগীর সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে সরবে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

কেন নয়? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। নারীও কিছু বলহীনেন লভ্য নয়।

তারপর পর পর তিন চারটে শনিবার জনকে দেখেছি জুনের সঙ্গে। সঙ্গে দেখেছি জুনের পরিবর্তন।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করবার বিরুদ্ধে নৈতিক যুক্তির মূল্য যতই সামান্য হোক, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পরপ্রভাতে যখন পূর্বরাত্রির আনন্দের মূল্য দিতে হয় তখন একবারও মনে হয় না যে ঠকিনি। প্রাপ্ত আনন্দের চেয়ে দেয় মূল্যকে তখন মনে হয সহস্রগুণ বেশি। মনে হয়, পেয়েছি যত দিয়েছি তার বেশি।

এই মূল্যদানের হিসাব নিকাশ কোনো এক অদৃশ্য হাত সর্বক্ষণ লিখে চলেছে আনন্দসন্ধানীর সর্বাঙ্গে। গায়ে লেখা মানে উল্কি, মুছে ফেলবার উপায় নেই। জুনের গায়ের লেখা আর কেউ পড়তে পেরেছে কিনা জানিনে। আমার ধারণা আমি পেরেছি।

জুনকে যখন প্রথম দেখেছিলুম তখন তার রূপের যে গুণটি আমাকে সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা ওর শিশুচিত নির্দোষিতা, অপরিমেয়

বিস্ময়বোধ, অপরিসীম উচ্ছ্বাস। রেসে গিয়ে ওর একবারও মনে হয়নি যে, কিছু অন্যায় করেছে, এথীনিয়ায় এসে যেন ওর একবারও সন্দেহ হয়নি যে প্রকাশ্যে অত্যধিক মদ্যপান ঠিক সদাচারসঙ্গত নয়। কোনো ঘোড়া সম্বন্ধে কোনো কিছু না জেনে অতগুলি টাকা পেয়ে ও নিজেই এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, তার সবগুলি টাকা সেই রাত্রেই শেষ না করা পর্যন্ত ওর যেন শান্তি ছিল না। এর সবগুলি কাজ জুন এমন ছেলেমানুষী উদ্দামতার সঙ্গে করছিল যে তখন কোনো নীতি-বাগীশ আপত্তি তোলাই অবান্তর হোতো।

মাত্র তিন চারটে সপ্তাহের ব্যবধানে সেই জুন কোথায় অন্তর্হিতা হয়ে গেছে!

আজ তার চোখের চারদিকে অনেকগুলি কালো চাকা। কালো চশমা পরে সেগুলি ঢাকতে তার চেষ্টার অন্ত নেই। তাই অনেক সময় জুনকে মনে হয় অন্য কোনো মেয়ে।

কে বিশ্বাস করবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে একজন লোকের এত পরিবর্তন হতে পারে? আজ তার কালো ফ্রকের বাহারের অন্ত নেই, অনাবৃত স্কন্ধে স্বচ্ছ অর্গ্যাণ্ডির ওড়না। চিবুকের উদ্ধত ভঙ্গিটি, যা সেই প্রথম দিন আমায় এমন আকর্ষণ করেছিল, আজ তা অনেকটা নত হয়েছে। চোখের উপর পেন্সিল দিয়ে দীর্ঘ ভ্রূ আঁকা হয়েছে, তবু ক্লান্তি লুকানো রয়নি।

আজ জুন এ টেবিল থেকে ও টেবিল প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে চলে; এথীনিয়ার প্রায় প্রত্যেক নিয়মিত গ্রাহকের সঙ্গে আজ তার পরিচয়; হাত তুলে সব পরিচিতকে সে হেসে অভিবাদন জানায়, মিষ্টি স্বরে বলে, 'হ্যালো'; প্রায় যে কোনো লোক তাকে হুইস্কি অফার করলে সে তা সানন্দে গ্রহণ করে, সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ আলাপ করে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে; দশটায় এথীনিয়া বন্ধ

হয়ে গেলে এমন কি অর্ধপরিচিতও কেউ যদি তাকে বলে ফিরপোয় নিয়ে যাবে, জুন তৎক্ষণাৎ রাজী হয়, ট্যাক্সিতে খুব দূরে সরে বসে না।

আমি জুনের এই দ্রুত বিবর্তন দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি, কখনো কখনো ব্যথিত হয়েছি। দেখেছি, জুন জনকে ছেড়ে ফিলিপের কাছে গেছে। কয়েক হপ্তা পরে স্মিথের কাছে।

তারও কয়েক হপ্তা পরে ক্যামিল্লোর কাছে।

একদিন গোল বাধল পরবর্তী পদক্ষেপে। অস্ট্রেলিয়ান, নিউজীল্যাণ্ডার, বৃটিশ, আইরিশ ইত্যাদি জকিরা জুনকে নিয়ে খেলেছে; খেলা ফুরোলে বসে থাকতে চায়নি। কিন্তু, ডন ক্যামিল্লোর সঙ্গে জুনকে যেন অনেক বেশি দিন দেখা গেল। শুধু তাই নয়, ইদানীং প্রায়ই এরা দু'জনে এসে আলাদা একটা টেবিলে বসত। অন্যান্য জকিদের সঙ্গে দূর থেকে দুয়েকটা কথা বলত, কিন্তু তাদের সঙ্গে গিয়ে তাদের দলে ভিড়ত না। শুধু তাই নয়, জুনের চাঞ্চল্যও যেন বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে। আজকাল সে ক্যামিল্লোর সঙ্গে আসে, দু'জনে দুটো বীয়ার খেয়ে বেরিয়ে চলে যায়। পানীয়ের উত্তেজনায় যেন আর প্রয়োজন নেই, কোথায় যেন তার চেয়েও মূল্যবান কিছু মিলেছে ওদের দু'জনের।

বলা বাহুল্য, ওদের এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবহার এথীনিয়ার অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মন্তব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। জুনের শান্তশীতল অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য তো আছেই, তাছাড়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে ক্যামিল্লোর সাম্প্রতিক ব্যর্থতাও উল্লিখিত হয়েছে। সত্যি বেচারী গত চার-পাঁচটা মীটিঙে একটাও প্লেস পর্যন্ত পায়নি। অন্তত আমার টেবিলের রেস-বিশেষজ্ঞ অংশীদার তাই বলছিলেন আমাকে।

আমি পাশেব টেবিলে উপবিষ্ট জুন আর ক্যামিল্লোকে দেখছিলুম। আমার অপবিচিত পানসঙ্গীর দৃষ্টিও সেদিকেই নিবদ্ধ ছিল। সঙ্গী বললেন, "জুনকে দেখে আপনার কী মনে হয়? বিশেষ করে আজকাল?"

অন্য সময় হলে আমি উত্তর এড়াতুম, অপবিচিতের প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতুম না। কিন্তু মোরারজী দেশাই যাই বলুন না কেন, মদ্যপানে হৃদ্যতা বাড়ে, মানুষ আব মানুষের মধ্যে বেড়াগুলি অন্তত সাময়িকভাবে ভেঙ্গে যায়। আমি তাই বললুম, "জুন এখন শান্ত।"

সঙ্গী বললেন, "কিন্তু এ শান্তি শুধু ঝড়েব পূর্বাভাষ।"

আমি সঙ্গীব হীন নৈবাশ্যে বিবক্ত হলুম। কাউকে শান্তিতে দেখলে যেন এদেব শান্তি নেই। জুন মাঝে কিছুদিন জানা অজানা নির্বিশেষে সবায়েব সঙ্গে একটু অন্তবঙ্গ হয়েছিল, আজ সে শুধু ক্যামিল্লোব সঙ্গে এসে বেশিক্ষণ না থেকে চলে যায়, তাই নিয়ে এথীনিয়ার আব সকলেব যেন অন্তর্দাহের শেষ নেই। সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, আবাব কবে জুন ক্যামিল্লো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্বজনীন হবে।

আমি নিজেও জুনের পরম অনুবাগী ছিলুম, কিন্তু শুধু দূর থেকে। আব সবাইকে সে হেসে যখন 'হ্যালো' বলেছে, আমি তখন ঈর্ষিত হয়েছি, প্রলুব্ধ হয়েছি তাকে একটা ড্রিংক অফার করে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যে কাছে পেতে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। সাহস পাইনি। শুধু দূর থেকে জুনেব নির্দোষ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ কবে মুগ্ধ হয়েছি, পবে তাব ক্ষীয়মাণ সৌন্দর্য লক্ষ্য করে ঈষৎ ব্যথিত হয়েছি। এই আপেক্ষিক অনন্তরঙ্গতার জন্যেই তাকে ক্যামিল্লোব সঙ্গে সুখী দেখেও তার অমঙ্গল কামনা করবার কথা মনে হয়নি।

সঙ্গীর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাই আমি খুশী হইনি। কিন্তু প্রতিবাদও করিনি। আমি নিঃশব্দে ওদের ছু'জনকে দেখছিলুম।

সত্যি মনে হোলো সঙ্গী একেবারে মিথ্যা বলেনি হয়তো। কিন্তু এথীনিয়ায় সে অবস্থায় আমি অপ্রত্যাশিত কিছু দেখলে নিজেকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিই যে হয়তো দ্রষ্টব্যের পরিবর্তন ঘটেনি, হয়তো শুধু দৃষ্টির বিভ্রম হয়েছে। তাই আমি জুন আর ক্যামিল্লোকে আরো ভালো করে দেখলুম।

জুন গম্ভীর, অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর। সামনের বীয়ারের গ্লাসে কখনো এক চুমুক দিচ্ছে কি দিচ্ছে না।

অপর পক্ষে ক্যামিল্লোর উত্তেজনার অন্ত নেই। সে তার হাত-পা নেড়ে যত কথা বলছিল তার সব আমি শুনতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু কিছু কিছু কানে আসছিল বৈকি। জুন কোনো কথার উত্তর দিচ্ছিল না, কোনোটা বা ভালো করে শুনছিলও না।

ক্যামিল্লো বলল, "চলো, তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও। আমি বড়ো ক্লান্ত।"

জুন বলল, "কোথায় ?"

"হোটেলে।"

"হোটেলে ভাড়া দেয়া হয়নি।"

"ও কিছু নয়। আমি আর দুয়েক হপ্তার মধ্যেই দিয়ে দেব।"

"কোত্থেকে ?"

"যেখান থেকে এতদিন দিয়েছি।"

"হাঃ। যাক্ গে।" জুন এক চুমুকে প্রায় পুরো এক গ্লাস বীয়ার শেষ করে যোগ করল, "বেয়ারা! ঔর এক বীয়ার!"

ক্যামিল্লো সভয়ে পকেটে হাত দিয়ে আস্তে বলল, "এই, আর বীয়ারে কাজ নেই। আমি আর টাকা আনিনি।"

"আনোনি, কারণ আনবার মতো কিছু ছিল না। বেয়ারা—"

"বেশ তাই। কিন্তু তাহলে আরো বীয়ার চাইছ কেন?"

জুন চেঁচিয়ে বলল, "চাইছি কেননা আমার চাই। বেয়ারা— এবং তোমার গ্লাস থেকেও খাব না।" জুন তৎক্ষণাৎ সশব্দে তার সামনের শূন্য গ্লাসটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল।

সবাই আবার জুনের দিকে তাকাল। আমিও। সঙ্গী ঠিকই বলেছে। শান্তি স্থান ছেড়ে দিয়েছে ঝড়ের জন্যে। আমার মনে পড়ে গেল এথীনিয়ায় প্রথম যেদিন জুনকে দেখেছিলুম সেদিনের কথা। কী করে সে তার বন্ধুকে বিদায় দিয়ে জনকে গ্রহণ কবেছিল, সেই কথা। সত্যকার কোমলতা সত্ত্বেও জুন যে উত্তেজিত হলে কী রকম নিষ্ঠুর ও কঠোর হতে পারে, সেদিন তা দেখেছিলুম। ফিরিঙ্গি বন্ধু নিঃশব্দে বিদায় নিযেছিল।

কিন্তু ক্যামিল্লো অত সহজে আসন ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে খুব মোলায়েম স্বরে, যেন কোনো অবুঝ শিশুকে ভোলাতে হচ্ছে, তেমনি স্বরে বলল, "জুন ডিয়ার, তোমার নেশা হয়েছে। চলো এবার।"

জুনের উত্তেজনা তখন চরমে। স্বরও। সে বলল, "নেশা হয়েছে? হা—হা—। আধ বোতল বীয়ার খেয়ে নেশা? এই দোকানের যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করো না? এর বেশি খাওয়াবার পয়সা নেই সেকথা বলতে দ্বিধা কেন? গত পাঁচটা রেসে কিছু করতে পারোনি, তাই তোমার

কাছে কেউ আর টিপস্ নিতেও আসে না, তাই কেউ মদও খাওয়ায়ংনা। লজ্জা করে না তার উপর আবার আমায় কথা শোনাতে যে আমার নেশা হয়েছে? নেশা যেন এতই শস্তা, বিনি পয়সায় হয়, দোকানে এসে বসলেই নেশা হয়, না?"

জুন এমনি তারস্বরে চিৎকার করে চলল। পুরানো জুন! কিন্তু প্রভেদ আছে। অমিতাচার তার পদচিহ্ন রেখে গেছে জুনের সর্বাঙ্গে। তার যৌবনের সেই আগেকার আকর্ষণ আর নেই। তাই তার চিৎকারে কোনো কোনো লোক কৌতুক বোধ করল, কেউ কেউ বা একটু বিরক্তও হোলো।

ক্যামিল্লো অপমানিত হয়ে অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু জুনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার সহ-জকিরা অন্য একটা টেবিলে বসেছিল—জন, স্মিথ, ফিলিপ, সবাই। তাদের মধ্যে কে একজন ক্যামিল্লোর কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু তার সাহায্য গ্রহণ করলে ক্যামিল্লো আরো অপমানিত হোতো। তাই সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে ক্যামিল্লো জুনের ঘাড়ে আস্তে একটা হাত রেখে বলল, "প্লী—জ, ডোণ্ট মেক এ সীন, ডিয়ার, লেট'স গো।"

"খবরদার তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।" জুন চেঁচিয়ে উঠল। ক্যামিল্লোর হাত সরিয়ে দিয়ে সে তার সামনের বীয়ারের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে দিল। পঞ্চম গ্লাস।

ক্যামিল্লো বেচারী কী করবে ভেবে পেল না। অনুনয় পরিহার করে আদেশ দিয়ে জুনকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। বলল, "জুন, ওঠো, এক্ষণি চলো আমার সঙ্গে। তা নইলে—"

"তা নইলে ?"

জুন প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্রূপের সঙ্গে ক্যামিল্লোর কথার পুনরাবৃত্তি করল প্রশ্নাকারে।

ক্যামিল্লো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জুনই তার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, "তা নইলে আমায় ফেলে চলে যাবে, তাই নয় ? সেভ য়োর ব্রেথ্, মাই ডিয়ার ডন। তুমি পায়ে ধরে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেও আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছিনে। আই হ্যাভ হ্যাড ইনাফ অব য়ু।"

"বেশ। আমি তাহলে যাচ্ছি। তুমি কখন, কার সঙ্গে ফিরছ ?"

জুন বলল, "আমি ? আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোমার জন্যে ভাবো। নট এ উইনার ইন সিক্স উইক্স, অ্যাণ্ড য়ু কল য়োরসেল্ফ্ এ জকি! হা—হা—। আই'ল টেল য়ু হোয়াট। বাই য়োরসেল্ফ্ এ পেয়ার অব বুল্স্। জোড়া বলদের গাড়ি চালিয়ে যদি দু'পয়সা রোজগার করতে পারো। হা—হা—।"

জুন তার নিজের রসিকতায় যে পরম প্রীত হয়েছিল তাতে সন্দেহ রইল না। কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা তখনো শেষ হয়নি। তাই আবার তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলল, "কার সঙ্গে যাব ? ভেরি ওয়েল দেন, ইফ য়ু মাস্ট নো, আমি ব্র্যাডলির সঙ্গে যাব। ডোণ্ট য়ু নো, আই গো উইথ দি উইনার, অলওয়েজ উইথ দি উইনার!"

ক্যামিল্লো আমি যে টেবিলে বসেছিলুম তারই পাশ দিয়ে চলে গেল। যেমন জুনের প্রথম ছেলেবন্ধু গিয়েছিল।

গত কয়েক সপ্তাহে ব্র্যাডলির চেয়ে বেশি উইনার কেউ চড়েনি। এখন সে তাই এথীনিয়ার 'হিরো'। সে বসেছিল অন্যান্য জকিদের সঙ্গে।

একটু পরে জুন আস্তে আস্তে ওই জকিদের টেবিলের দিকে এগুতে থাকল। স্পষ্টই বোঝা গেল, সবাই বেশ বিব্রত হচ্ছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যারা জুনকে কাছে পেলে আর কিছু চাইত না, সানন্দে তাকে যত খুশি মদ খাওয়াতো, আজ তারা সবাই কেমন যেন সন্ত্রস্ত হোলো জুনের আসন্ন উপস্থিতিব আশঙ্কায়। জুন এত সব লক্ষ্য কবেনি, সাদব অভ্যর্থনায় সে অভ্যস্ত।

জুন বলল, "ব্র্যাডলি ডিয়াব, যু উইল টেক মি হোম, ওণ্ট যু?"

ব্র্যাডলি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "সবি, জুন, আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আমাব জন্য একজন অপেক্ষা কবছে। শী উইল বি ম্যাড ইফ আই ডোণ্ট গো নাউ। গুড নাইট জুন, গুড নাইট ফোব্‌স্।" ব্র্যাডলি বেবিয়ে গেল।

জুন আবাব চেষ্টা করল, "ফিলিপ ডিয়ার, যু উইল গিভ মি এ ড্রিংক, ওণ্ট যু?"

ফিলিপও ততক্ষণে ওঠবার আয়োজন কবছিল। যাবাব আগে শুধু বলল, "গুড নাইট, জুন, আই রীয়্যালি মাস্ট গো নাউ।"

"জন, য়ু?"

"সবি, জুন। গুড নাইট।"

"অ্যাণ্ড স্মিথ?"

"গুড নাইট, জুন, আই শুড হ্যাভ বীন হোম অ্যান আওযার এগো।"

একে একে সবাই ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেল—এত জোরে ওবা ঘোড়ায় চড়েও কখনো চলেনি বোধহয়।

পৃষ্ঠা সতর

প্রায় দশটা বাজছিল। প্রায় সবাই চলে গিয়েছিল। জুন ছিল জকিদের সেই শূন্য টেবিলে, সামনে বেয়ারা দাঁড়িয়ে বিল নিয়ে।

আর আমি ছিলুম আমার টেবিলে। আমি অন্য একটা বেয়ারাকে ডেকে জেনে নিলুম জুনের বিলের দাম। টাকাটা দিয়ে আরো চার টাকা যোগ করলুম, জুনের জন্যে আরো একটা বীয়ারের জন্যে। বেরিয়ে আসবার আগে দেখলুম জুন টেবিলের উপর মাথা রেখে কাঁদছে। ওই অতিরিক্ত বীয়ারটায় প্রত্যাখ্যাত জুনের প্রয়োজন ছিল সেই রাত্রে।

## অনুলেখক

রীতি অনুযায়ী ডাউলিং সেদিনও পাঁচটার একটু পরেই আমার কাছ থেকে ছুটি নিতে এলো। আমাদের এই দৈনিক বিদায়-সম্ভাষণের ভাষারও কোনো দিন ব্যতিক্রম হয় না।

ডাউলিং বলে, "হ্যাভ য়ু গট এনিথিং মোর ফর মী, সার?"

আমি বলি, "আই ডোণ্ট থিঙ্ক সো, ডাউলিং। গুড্ নাইট।"

ডাউলিংও "গুড নাইট" বলে অন্তর্হিত হয়।

কোথায় যায়, কী করে, কিছুই জানিনে। কৌতূহলও অপ্রবল। আমার জানতে চাওয়াই অসমীচীন। ডাউলিং আমার স্টেনোগ্রাফার, আমি তার মনিব। এর মধ্যে মানবীয় অন্তরঙ্গতার স্থান নেই। আমার কাছে সে একটা জীবন্ত ব্যক্তি নয়, আমিও বোধ হয় ওর কাছে আস্ত একটা মানুষ নই। আমাদের দু'জনেরই সম্বন্ধ একান্ত আংশিক। সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা—এই আট ঘণ্টায় আমি মানুষ নই, ম্যানেজার; ডাউলিং মানুষ নয়, স্টেনোগ্রাফার। আমার কাজ আদেশ দেওয়া, ওর কাজ আদেশ মানা। এই সম্পর্কে হৃদয় অবান্তর একটা প্রত্যঙ্গ।

অফিসের বাইরে আমার যে একটা আনন্দবেদনান্দোলিত জীবন আছে, ডাউলিঙের সে কথা জানতে চাইবার অধিকার নেই। অপর পক্ষে ডাউলিঙের যে অফিসবহির্ভূত একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে, তা শুধু গল্প-লেখক হিসাবে আমাকে চেষ্টা করে মনে করতে হয়।

অনুলেখক

পৃষ্ঠা দুই

আমার টাইপরাইটার বন্ধ করলে যেমন খট করে একটা আওয়াজ হয়, ডাউলিং আব আমাব গুডনাইটও তেমনি একটা শব্দ। তার বেশি নয়।

কিন্তু ডাউলিং সেদিন আমার শুভরাত্রি বলবার পরেও বিদায় নিল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বইল। স্পষ্টতই কিছু বক্তব্য আছে। আমাব সামনের কাগজ থেকে চোখ তুলে আমি বললুম, "কী হোলো, ডাউলিং। কিছু বলতে চাও কি ?"

ডাউলিং বিষণ্ণ বদনে বলল, "হ্যাঁ। আপনার কি এখন মিনিট দশেক সময় হবে ? তা নইলে আমি বরং বাইবে অপেক্ষা কবি। আপনাব কাজ শেষ হলে আবাব আসব। ব্যাপারটা একটু ব্যক্তিগত।"

সত্য বলতে কি, ডাউলিংকে বিষণ্ণ দেখলে আমি একটু ভয় পাই। এর আগে যতবার ও ওই বকম ভঙ্গিতে আমাকে কিছু বলতে চেয়েছে, প্রতিবারই দেখা গেছে, ওটা ঋণ প্রার্থনার ভূমিকা। ওব মাইনে কম নয়, কিন্তু খরচা তাবও বেশি। তাই ধাব চাওযা ওব স্বভাব। প্রতিবাবই বলে, এবারই শেষ। আব কখনো ধার চাইবে না। বর্তমান এই সমূহ বিপদটা কাটিয়ে উঠলে এব পব থেকে সাবধান হবে।

অজুহাত উদ্ভাবনে ওর অসামান্য পারদর্শিতা। অফিসের কাজে ওর দক্ষতা পবিমিত, স্মৃতিশক্তি একান্ত অনির্ভরযোগ্য, কিন্তু এই অজুহাতগুলি ঠিক মনে থাকে ওর। ওর মা দু'বাব মাবা যায়নি—শুধু একবারেব জন্যেই ধার চেয়েছে। বাবাকে দু'বার বার্মা পাঠায়নি—শুধু একবাবই ওই ওজবে ধার চেয়েছে। প্রত্যেকবাব ওই রকম কোন না কোন করুণ একটা গল্প ওর ওষ্ঠাগ্রে।

আমাব অনেকবাব মনে হয়েছে যে, আমার আব গল্প লিখতে চেষ্টা করা উচিত নয় : আমাব ডাউলিঙেব মতো উদ্ভাবনী প্রতিভা নেই।

কিন্তু এবার আমাকে কঠোর হতে হবে। ডাউলিঙের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ওর মিথ্যাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমি ম্যানেজার হোলে কী হবে, কঠোর হতে পারিনে। জানি ও মিছে কথা বলে, তবু প্রতিবারই অবিশ্বাস করতে ভয় পাই। মনে হয়, ঠিক এইবারই যদি পালে বাঘ পড়ে থাকে? এবার যদি সত্যি ওর মেয়ের অসুখ করে থাকে? ধার না পেয়ে সত্যি যদি মেয়েটা বিনা চিকিৎসার মরে যায়? তখন নিজেকে ক্ষমা করব কী করে?

ডাউলিং গত সাত বছর সমানে আমার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। ভাবলুম, এবার আর নয়। সময় চাইলুম, বললুম, "আচ্ছা আমি এই চিঠিটা শেষ করে নিই। দশ মিনিট পরে এসো।"

সত্যি কোনো জরুরী চিঠি ছিল না। সময় নিয়েছিলুম নিজের মনকে শক্ত করতে। "না" কথাটা বলতে শিখতে। স্থির করলুম ডাউলিংকে তার কথা বলতেই দেব না। ডেকেই বলব, "ইফ ইট'স এ লোন য়ু'র আফটার, দি আনসার ইজ নো।"

ডাকলুম ডাউলিংকে। ও এলো। কিন্তু রূঢ় হতে পারলুম না। বললুম, হয়তো একটু হাসিও যোগ করে, "য়ু ওয়াণ্ট অ্যানাদার লোন আই সাপোজ!"

"বাট য়ু মাস্ট হীয়ার মি ফার্স্ট, সার।" যেন ঋণের আবেদনটা গৌণ, প্রধান উদ্দেশ্য আমার কাছে আত্মজীবন উদ্‌ঘাটন করা!

ডাউলিং অভিনয় জানে বটে।

কিন্তু ডাউলিঙের মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি আমার মত পরিবর্তন করতে হোলো। এমন মলিন মুখ ডাউলিংও আগে কখনো পরেনি। শুধু মুখে

নয়; তার সর্বাঙ্গে বিপর্যয় পরিব্যাপ্ত। শার্টের কলারটা ফেঁসে গেছে, টাইয়ের বালাই নেই।' স্পষ্টই বোঝা যায় আজ স্নান করেনি। ওর জাত পরিচ্ছন্নতার জন্যে খ্যাত নয়, কিন্তু ডাউলিংকে অস্বাভাবিক রকম অপরিষ্কার ও অসহায় দেখাচ্ছিল। সত্যি এবার সাংঘাতিক কিছু হয়ে থাকবে। আমার কঠোর হবার প্রতিজ্ঞা ইতিমধ্যেই শিথিল হয়েছে।

ডাউলিং আমার সামনের চেয়ারে মুখ নিচু করে নিঃশব্দে বসে ছিল। এমন বাগবিমুখতাই ওর পক্ষে অস্বাভাবিক। আমিই বললুম, "আমি ভেবেছিলুম তোমার কিছু বলবার আছে?"

ডাউলিং আমার দিকে না তাকিয়ে একটা পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অত্যন্ত আস্তে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় শুরু করব বুঝতে পারছিনে। ব্যাপারটা এমনই ব্যক্তিগত ও কিছুটা লজ্জাকর যে—"

আমি ওর দ্বিধা কাটাবার জন্যে বললুম, "কাম, কাম, লজ্জার প্রশ্ন না তোলাই ভালো। কিছু বলবার থাকলে বলে ফেলাই ভালো। শীতকালে জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে জলে আর নামাই হয় না। ঝাঁপ দেয়াই উচিত।"

ডাউলিং বলল, "আমার স্ত্রীকে আপনি দেখেছিলেন আমার মেয়ের বিয়ের সময়, সেণ্ট অ্যানডরুজ কার্কে, মনে আছে কিনা জানিনে।"

"আছে বৈকি? নিশ্চয়ই আছে।"

আমি কথাটা বললুম সজোর প্রত্যয়ের সঙ্গে। কেননা সত্যি আমার ভালো করে যে মনে ছিল তা নয়। যে বিয়ের কথা ডাউলিং বলছিল সেটা হয়েছিল আমার এ অফিসে যোগ দেবার দিন দশেকের মধ্যে। গীর্জার সেই ভীড়ে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়ে থাকবে, যদিও আজ তাদের একজনকেও বোধহয় চিনতে পারব না।

তবু মিসেস ডাউলিংকে অস্পষ্টভাবে একটু মনে ছিল, কেননা পরিচিত হবার পরেই মহিলা একটু দূরে সরে যেতে আমার মাদ্রাজী সহকর্মী মন্তব্য করেছিল, "ফ্যাট, ফর্টি, অ্যাণ্ড নট সো ফেয়ার!" বর্ণনাটা সদয় নয়, কিন্তু, অসত্যও নয়।

ডাউলিং চুপ করেছিল। আমি বললুম, "ডোণ্ট টেল মি শী ইজ ইল!"

হঠাৎ ডাউলিং যেন কথা খুঁজে পেল। একান্ত অপ্রত্যাশিত উষ্মার সঙ্গে বলল, "নো, শী ইজন'ট ইল্। আই উইশ শী ওয়্যার। আই উইশ শী ওয়াজ ডেড্!"

আমার সাধারণত শান্ত-শিষ্ট স্টেনোগ্রাফারের এ কোন নাটকীয় উত্তেজনা? আজ্ঞাবাহী একটা যন্ত্র নয়, ডাউলিং তাহলে মানুষ? রাগতে জানে, কাঁদতে জানে?

আমি কী বলব ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলুম। ডাউলিং তার অসংযত উত্তেজনার জন্যে দুঃখ জ্ঞাপন করে বলল, "এবং সেই বিয়েতে আরো একজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম, মনে আছে?"

"কে?"

"নাম ওর সার্জেণ্ট রবিনসন। সেই যে বছর বাইশ বয়সের একটি ছেলে, নীল চোখ, সোনালী চুল, লুকস সামহোয়াট লাইক এ প্যানসি, এখানে আর-এ-এফ ডিপোর সিকিউরিটিতে ছিল। আমারই ফ্ল্যাটে থাকত, পেয়িং গেস্ট হয়ে।"

আমার এত শত মনে ছিল না। কিন্তু ওই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কুলে ইংরেজ দর্শনে মৃদু বিস্ময়ের কথা মনে ছিল। এখন তার চেহারাটা মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ডাউলিং মিথ্যা বলেনি। সত্যি রবিনসনকে দেখতে

বড়ো ছেলেমানুষ, বয়স বাইশের বেশি নয়, কিন্তু মনে হয় তার চেয়েও কম, ষোলো কি সতেরো। মুখময় একটা নির্দোষ পরিবেশ। যেন মাথা খোলেনি, গলা ভাঙেনি। শীতের দেশে পাকতে দেরি হয়, আমাদের দেশের জোরালো রোদ মনে রঙ ধরায় অনেক আগে।

আমি ডাউলিংকে বললুম, "রবিনসন, হোয়াট অ্যাবাউট হিম্?"

"চুয়াল্লিশের পর থেকেই ও আমার ওখানে ছিল। মাসে পঁচাত্তর টাকা দিত। আমার গ্রাণ্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা আপনি দেখেননি। রাস্তার দিকে বারাণ্ডার কাছে একটা ঘর আছে, আমার মেয়েই আগে ওখানে থাকত। ওর যখন বিয়ে হয়ে গেল আর ওই ঘরটা খালি হোলো, আমিই ওকে ওই ঘরে থাকতে বললুম। পেগী, মানে আমার স্ত্রী, আপত্তি করেছিল। কিন্তু ছেলেটা ভালো, অন্তত ভালো ছিল। মদ খায় না, সিগারেট খায় না, যদিও আর-এ-এফ। ওর বেশির ভাগই ডিউটি থাকত রাত্রে, আর দিনে এসে বেচারী ঘুমোতো। বয়স কম তো, তাই ঘুম একটু বেশি। তবু স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে ক্লান্ত শরীরেও কখনো কোনো কাজে আমি সাহায্য করতে বললে 'না' বলেনি, সানন্দে করেছে। পেয়িং গেস্ট হলে কী হয়, বাড়ির ছেলেরই মতো ছিল। আমাকে, শুধু আমাকে নয়, বাড়ির সবাইকে একেবারে আপন করে নিয়েছিল। ইংরেজ, ডেভনশায়ারে ছোটোখাটো একটা ফার্ম আছে, দেশে মা আর বোন আছে। এখানে এসে বড়ো একা বোধ করত, তাই আমার বাড়িতে থাকতে পেয়ে যেন আবার সঙ্গ পেয়ে বেচারী বেঁচে গেল। আর এতটুকু রেশল্ অ্যারোগেন্স নেই ওর মনে। আমরা যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর ও যে খাঁটি ইংরেজ তা কখনো বোঝাই যেত না। আমার স্ত্রীও ওকে দেখতো ছেলের মতো।"

ডাউলিং নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামলে আমি বললুম, "পরে ছেলে বুঝি বাবাজীবন হতে চাইল ? তোমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম বুঝি ?"

অত তাড়াতাড়ি কাহিনীর শেষে আসতে ডাউলিং ব্যগ্র ছিল না। আমার বিরতি উপেক্ষা করে ডাউলিং বলল, "যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও রবিনসনের রিপ্যাট্রিয়শনে দেরি হোলো। ও আমার ওখানেই থেকে গেল। ডিমব্‌ড্‌ হবার পরেও বলল, এদেশেই থেকে যাবে। এখানে বামার লরিতে ওর একটা কাজ পেতেও অসুবিধা হোলো না।

"একদিন আমাকে বলল, 'তোমার এখানে থেকে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে এখন দেশে ফিরলেই মনে হবে বিদেশে এসেছি, আপন ঘরে গেলে মনে হবে আপন জন ফেলে এসেছি।' আমার ভালো লাগল। জানেন তো, ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা কোনো স্নেহ বা শ্রদ্ধাই পাইনে। তাদেরই একজন আমাদের এমন আপন করে নিয়েছে, এতে ভালো লাগবে বৈকি।

"আমি বললুম, 'তাই ভালো।' আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কেউ একটু উন্নতি করলে তৎক্ষণাৎ স্বজাতির কথা ভুলে যায়, তখন তার একমাত্র কাম্য হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানত্ব অস্বীকার করা, বিলেতে গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিশে অতীত ভুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। 'এসো, আমরা তোমাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান করি!' কথাগুলি হাসতে হাসতে বলেছিলুম, আইসাইয়া রেস্তরাঁয় একটা রাম্‌ খেতে খেতে। রবিনসনও আমার কথা শুনে এত খুশি হয়েছিল যে, জীবনে সেই প্রথম সে এক গেলাস বীয়ার খেলো। তার পর থেকে ওই আমাদের বাঁধা রুটিন ছিল। আমি অফিস থেকে সোজা যেতুম আইসাইয়ায়, রবিনসনও অফিস থেকে বেরিয়ে ওখানে আসত। ও ঠিক এক বোতল বীয়ার খেতো, আর আমি—"

পৃষ্ঠা আট

এখানে ডাউলিংকে আমার থামিয়ে দিতে হোলো। তার ব্যক্তিগত জীবনের এত কথা আমাকে শোনানোর মধ্যে ঔদ্ধত্যের ইঙ্গিত আছে বলে মনে হোলো। সে অন্তরঙ্গতায় ওর অধিকার নেই। আমার পক্ষে শোনাও অশোভন। উচ্চনীচের প্রভেদটা এতই অবাস্তব, তবু এত প্রয়োজনীয়, যে ওটা বজায় রাখতে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়।

আমি বললুম, "কাট ইট শর্ট, প্লীজ।"

কিন্তু আঘাত দেবার ইচ্ছা ছিল না। তাই হেসে যোগ করলুম, "আমি তো তোমার ফাদার কনফেসর নই। আমাকে অত কথা নাই বললে।"

ডাউলিং এই সমস্ত মৃদু অপমানে অনভ্যস্ত নয়। একটু থেমে বলল, "আই অ্যাম সরি, সার। কিন্তু আমি ভাবছিলুম কি, পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা না বললে আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, আপনি আমাকে বোধহয় ভুল বুঝবেন।"

আমি অভয় দিলুম।

তবু ডাউলিং তখনই শুরু করতে পারল না। সে যেন তার কাহিনীর এমন জায়গায় এসেছে যেখানে বলতে একটু ইতস্তত করতেই হয়।

কিন্তু একটি বিষয়ে ডাউলিং ইতিমধ্যে সফল হয়েছিল। আমি তার বর্ণনের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও তার কাহিনীতে কৌতূহলী হয়েছিলুম। শুধু তাই নয়, এই প্রথম আমি ডাউলিঙের কথায় বিশ্বাস করছিলুম। সর্বদা সত্যবাদী এমন লোক দুর্লভ; কিন্তু সর্বদা মিথ্যাবাদী এমন মানুষও বিরল। সর্বদা মিথ্যাভাষণ ডাউলিঙেরও অসাধ্য।

সুস্পষ্ট অস্বস্তির সঙ্গে ডাউলিং তার আখ্যান আবার শুরু করল, "পেগীকে

আপনি দেখেছেন। মনে না থাকলে বিস্মিত হবার কারণ নেই, মনে রাখবার মতো রূপ ওর নয়।"

আমি মৃদু প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করলুম, নিতান্তই ভদ্রতার প্রয়োজনে, কিন্তু ডাউলিং আমায় কিছু বলতে না দিয়ে বলে চলল, "শুধু রূপ নেই তাই নয়। বয়সেও আমার চেয়ে বছর তিনেক বড়ো। আমি আটত্রিশ, ও একচল্লিশ।"

ইংরেজিতে একটা কথা আছে যার কোনো মানে নেই। আমি আমার বিস্ময় গোপন করে সেইটেই প্রয়োগ করলুম, "রিয়্যালি ?"

"ইয়েস, নট এ ডে ইয়ংগার। শুধু তাই নয়, পেগী ইজ্ ভেরি মীন্। যাক্, আমাদের চারটি সন্তান আছে, কিন্তু চার দিনের জন্যেও আমাদেব মধ্যে ভালোবাসা ছিল কি না সন্দেহ। আমরা ক্যাথলিক, ডিভোর্স নেই, তাই মেনে নিতে হয়েছে। সতেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে তবু আমরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি কখনো। কলহ হয়েছে, কিন্তু বাইরের কেউ জানতে পায়নি। মিল নেই, তবু উই কেপ্ট আপ্ অ্যাপিয়ারেন্সেস। এই রবিনসনই কতবার আমাদের দাম্পত্য সুখে মুগ্ধ হয়ে বলেছে আমরা নাকি ওকে ওর মা-বাবার কথা মনে করিয়ে দিই!"

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলুম না ডাউলিং ঠিক কী বলতে চাইছে। এখন পর্যন্ত যা কিছু বলেছে তার পরিণতি কোথায় ? আর সে পরিণতির সঙ্গে আমারই বা যোগ কোথায় ?

দীর্ঘ কাহিনী হ্রস্ব করবার জন্যে বললুম, "সতেরো বছর না হয় অমনি কাটল, হঠাৎ পরিবর্তন হোলো কোথায় ?"

ডাউলিং এক মুহূর্তের জন্যেও থামল না। তার স্বভাবগত বাগ্‌বাহুল্য

পরিহার করে টেলিগ্রাফিক সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে বলল, "কাল। রবিবার। আমি আমারি রবিবারের বীয়ারের জন্য আইসাইয়ায় গিয়েছিলুম। ওরা জানতো আমি একটার আগে ফিরি না। একটু আগে ফিরে দেখি ওরা দু'জনে আমার বিছানায়। দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ করেনি।"

"ওরা কারা?"

"পেগী আর সার্জেন্ট রবিনসন।"

আমি ডাউলিঙের আহত, অপমানিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে একটা কাগজ নাড়াচাড়া করতে চেষ্টা করলুম। কী বলবার আছে এ অবস্থায়? তবু ভাগ্য, ডাউলিং তার কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স দীর্ঘ করেনি। বর্ণনায় আবেগ এনে আমায় আর বিব্রত করেনি।

কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ওই কথাগুলি আমাব কানের উপর পড়ছিল হাতুড়ির ঘায়ের মতো। তবু বিচলিত হওয়া আমায় সাজে না। আমি সেন্টি-মেণ্টাল বাঙলা গল্পলেখক নই। আমি হৃদয়হীন ম্যানেজর। যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললুম, "ওয়েল, ওয়েল।"

এবার আরো একটা বিদেশী ভাষার আশ্রয় নিয়ে বললুম, "সে' লা ভী। তা রবিনসন কী বলে?"

"সেটা অবান্তর। রবিনসন আর কী বলবে? ও যে জয়ী। ওর তো কিছু বলারই দরকার নেই। কিছু বলেওনি। আমাকে দেখে উদ্ধত হাসির সঙ্গে আমাদের ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে গেছে। নিঃশব্দে বলে গেছে, 'য়ু ব্লাডি ফুল!'"

গাম্ভীর্যের মধ্যে আবার আমি লঘুতা আনতে চেষ্টা করলুম, বললুম, "আচার বা ভাষা কোনোটাকেই ঠিক শালীনতায় সমৃদ্ধ বলা চলে কি?"

একটু শান্ত হয়ে ডাউলিং বলল, "না, শালীন নয়, কিন্তু সত্যি বলেছে। আমি নির্বোধ ছাড়া কী? আমার মতো বোকা কোথায় এ সংসারে?"

এই আত্মধিক্কারে আমি আরো বিব্রত হলুম। অফিসের কাজে অক্ষমতার জন্যে আমি নিজেই ডাউলিংকে বহুবার বোকা মনে করেছি। বহুবার ওকে সেকথা বলেছিও নিশ্চয়ই। কিন্তু রবিনসনের কথা আলাদা। তার পক্ষে ডাউলিংকে নির্বোধ বলা যেন চুরি করে সব কিছু নিয়ে গিয়ে গৃহস্থকে টেলিফোনে গাল দেয়া—কেন সতর্ক হওনি?

আমি বাকিটা জানতে চেয়ে বললুম, "মিসেস ডাউলিং কী বলেন? তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন?"

"ভুল বোঝা? ফার ফ্রম ইট। রবিনসন চলে যাবার পরেও আমি অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারিনি। পেগীব দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। পেগী বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে হেলাভরে একটা চাদর টেনে দিল তার নির্লজ্জ অনাচ্ছাদিত গায়ের উপর, যেন না টেনে দিলেও ক্ষতি ছিল না। লজ্জা যেন আমার, ওর নয়। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে, যেন কিছু একটা বলতে হবে বলে, বলল, 'বোকার মতো ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ?' আমি কিছু না বলে সেখান থেকে চলে এলুম। একবার ভাবলুম, দিই শেষ করে ওই হাতুড়িটা দিয়ে। পরে মনে হোলো, থাক, কী হবে রাগারাগি করে? লোক হাসিয়ে কী হবে?"

আমি তখনো ম্যানেজর, ডাইলিঙের কাজেব বিচারক, তার অনুভূতির অংশীদার নই। বললুম, "একটু আগে বলেছিলে তোমাদের মধ্যে কোনোদিনই প্রেম ছিল না। সেক্ষেত্রে—"

"এই আপনাদের অর্থাৎ ব্যাচিলরদের একটা রোম্যান্টিক কুসংস্কার!

বিবাহে প্রেম অপরিহার্য তো নয়ই, বরং দাম্পত্যে ও বস্তু প্রতিবন্ধক। বিয়ে একটা ব্যবস্থা, দুটি মানুষের একটা যৌথ বন্দোবস্ত। দু' পক্ষেরই কিছু কিছু কর্তব্য থাকবে, সেগুলি যথারীতি সম্পাদিত হোলে কোনো পক্ষেরই আর কিছু বলার থাকবে না। তাকেই বলে আদর্শ বিবাহ।"

ডাউলিঙের জন্যে এতক্ষণ আমার যে অনুকম্পা ছিল, এখন তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হোলো। মনে হোলো, রবিনসনেব হাতে সে তার যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে। আমার নৈরাশ্য গোপন করলুম, কিন্তু কৌতূহল রয়ে গেল। বললুম, "তোমার নালিশ তাহলে এই যে, তোমার দাম্পত্যের কটিনে ছেদ পড়েছে?"

"শুধু তাই নয়, মিস্টাব মজুমদার," এবাবে ডাউলিঙের কণ্ঠে সত্যকার বেদনাব স্বর, "শুধু তাই নয়। ব্যথাটা অন্য। গ্লানিটা পরাজয়ের। আমি কিছু হারিয়েছি বলে কাঁদছি নে: আমার কাছ থেকে আমার নিজের কিছু একটা কেড়ে নেয়া হয়েছে! শুধু তাই নয়, রবিনসনই শুধু আমাকে অবজ্ঞা করে না, পেগীও। এতদিন সে স্বামীব অবহেলায় অপমানিত হয়ে নিজেকে কিছুটা ভদ্রগোছের দাসীমাত্র মনে করত। এখন সে সম্রাজ্ঞী, সে জানে, এই পৃথিবীতে একজন পুরুষ আছে এবং সে আমার চেয়ে তরুণ—যাব সে মনোহরণ কবতে পেরেছে। এই তার দম্ভ।"

আগেই বলেছি, ডাউলিঙেব সঙ্গে আমি এসব আলোচনায় যোগ দিতে পারিনে। সে তার যোগ্য নয়। আমি তাই জিজ্ঞাসা কবলুম, কেন সে এত কথা আমাকে বলতে চাইছে। কিসে আমি সাহায্য করতে পারি।

ডাউলিং বলল, "ওই যা বলছিলুম আপনাকে। একবার মনে হয়েছিল নিঃশব্দে পলায়ন করব না। পেগী আব রবিনসনকে শিক্ষা না দিয়ে সরে পড়ব না। অন্যায় সহ্য করে তাব প্রশ্রয় দেব না।"

একটু থেমে বলল, "কিন্তু ভেবে দেখলুম, এমন লড়াইয়ে ওদের আহ্বান করা বোকামির উপর চূড়ান্ত বোকামি হবে। এমন লড়াইয়ের শেষ যে শুরু হবার আগেই স্থির হয়ে আছে, ফলাফলও জানা। আমি লড়াইয়ের আগেই হেরে বসে আছি!"

সামান্ত মানুষকে ট্র্যাজিক চরিত্রে মানায় না, হাস্তকর মনে হয় এবং আমার স্টেনোগ্রাফার ডাউলিং যে সব বিষয়ে একান্তই সামান্ত ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতের অবকাশ নেই। স্বনিযুক্ত বীরের ভূমিকায় ডাউলিংকে দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল না, কিন্তু ক্রন্দনও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেনি।

ক্রমে ডাউলিং আমায় বলল, সে পশ্চাদপসরণ করবে বলে স্থির করেছে। গ্রাণ্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাট সে ছেড়ে দেবে রবিনসন আর পেগীর পাপাচারের জন্যে। নিজেকে স্থানান্তরিত করবে রিপন স্ট্রীটের একটা বোর্ডিং হাউসে। একটা ঘর। মাসিক দক্ষিণা দেড়শো টাকা। দু মাসের টাকা অগ্রিম দিতে হবে।

এ-ডাউলিং আমার চেনা।

বললুম, "দরখাস্ত লিখেছ?"

দরখাস্ত তৈরি। পকেট থেকে বের করে কাগজটা আমার হাতে দিয়ে ডাউলিং তার চশমাটা খুলে ময়লা একটা রুমাল দিয়ে প্রথমে চোখ ও পরে চশমা মুছতে লাগল। দৃশ্যটা হাস্তকর। কিন্তু কারো কান্না দেখে আমি কিছুতেই হাসতে পারিনে। এমনকি, অধীনস্থ কর্মচারীর কান্না দেখেও নয়।

আমি ডাউলিঙের কথা বিশ্বাস করে তার ঋণের আবেদন মঞ্জুর করলুম। পরে খবর নিয়ে জেনেছিলুম, ডাউলিং এবার অন্তত সত্যি আমায় মিথ্যা বলেনি। পেগী ও রবিনসনের কীর্তি ওদের সম্প্রদায়ে অপ্রচারিত থাকে নি।

রবিন্সনের বন্ধুরা তার পেগী-বিজয়ে সম্বর্ধনা জানিয়ে বীয়ার খাইয়েছে। পেগীর পরিচিতাদের মতামত জানি নে। জানি যে, সবাই ডাউলিংকে দেখে হেসেছে!

বলা বাহুল্য, আমি আর ডাউলিঙের সঙ্গে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি। সে-ও করেনি। কিন্তু ম্যানেজর হলেও আমি গল্পসন্ধানী।

সেই কাহিনী শোনা থেকে কেবলই আমার মনে হোতো যে, আমার এই ডাউলিঙের মধ্যে বৃহৎ একটা করুণ গল্পের উপাদান নিহিত আছে। মনে মনে তাকে ওথেলোর সঙ্গে তুলনা করেছি। সত্যি তো, ডাউলিং যখন সেই অন্যায়ের প্রতিকারের কথা বলছিল, তখন কি সে ওথেলোর একটা বিলাপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়নি?

তাছাড়া আমার বহুদিনের বাসনা, বঞ্চিত, উপহসিত স্বামীর দুঃখ নিয়ে একটা গল্প বা উপন্যাস রচনা করা। ওথেলোর মতো হাই ট্র্যাজেডির পর্যায়ে নয়, আজকের দিনে ওটা অতি-নাটকীয়; কিন্তু সাধারণত গল্পে বা উপন্যাসে cuckold-কে যে হাস্যকর করে দেখানো হয়, সে রকমও নয়। আমার বঞ্চিত স্বামী নিখিলেশের মতো সহিষ্ণু হবে না, মহিমের মতো উদাসীন হবে না, ওথেলোর মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে না, কাউণ্ট কারেনিনের মতো হৃদয়হীন হবে না। সে হবে ডাউলিঙের মতো—ডাউলিঙের মতো—মতো কী?

সেইটেই আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারিনি এবং সেই জন্যেই সে গল্প আর লেখা হয়নি। ডাউলিঙের অলক্ষ্যে তাকে লক্ষ্য করেছি, পেগী ও রবিনসনের অসাধুতালব্ধ সুখের ঈপ্সিত ভঙ্গুরতা নিয়ে জল্পনাকল্পনা করেছি। সর্বোপরি ডাউলিঙের বেদনার পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছি।

এই শেষ চেষ্টাটায় ডাউলিং আমার চোখে ক্রমে তার সামান্যতা পরিহার করে মহত্বের লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে। আমার অলিখিত গল্পের নায়ক হিসাবে ডাউলিং সামান্য ব্যক্তি নয়। সে স্ত্রী-জাতির নিষ্ঠুর চপলতার নির্দোষ শহীদ। সে অপর পুরুষের অপহরণপ্রবণতার নিরপরাধ ভুক্তভোগী।

অথচ কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ডাউলিং তার অপরিমেয় শোকের অবর্ণনীয় বোঝা দিনের পর দিন নিঃশব্দে বহন করে চলেছে। কাজ করে যাচ্ছে, যেন কিছু হয়নি। যেন জীবনের একটা দিক তার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি।

আর কী অসীম আমার স্টেনোগ্রাফারের ক্ষমাশীলতা! হঠকারী ওথেলোর মতো সে পেগীকে খুন করেনি। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সে রবিনসনকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানায় নি। সমস্ত অভিশাপ নিজে মেনে নিয়েছে। শুধু নিজেকে ওদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। নিজের রক্তাক্ত হৃদয় লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরে অনুকম্পা ভিক্ষা করেনি, ময়লা শার্টের তলায় চেপে রেখে আপন কর্তব্য করে চলেছে।

আমার অফিসে ডাউলিং সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তার তুলনা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সামান্য কেরানী সম্রাট হয়েছে তার স্ত্রীর প্রেমের মহিমায়। আমি তো বলি, তার চেয়ে তুচ্ছ কিছু নেই এ-সংসারে। সামান্য লোক প্রেমে সম্রাট হয় না—মিলন অধিকাংশের জীবনে দৈনন্দিন ঘটনা। সামান্য ব্যক্তি অসামান্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় তার বিরহের মহত্বে। সেই দুর্লভ দুর্ভাগ্যে মানুষের সত্যকার পরিচয়। তখন সাধারণ ব্যক্তি তার অসাধারণত্বের প্রমাণ দেয়।

ডাউলিংই আমার গল্পের যোগ্য নায়ক।

পৃষ্ঠা ষোল

গল্প লেখবার আগে একদিন ডাউলিংকে পরবর্তী ঘটনা জিজ্ঞাসা করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বললুম, "ডাউলিং, তোমার নতুন ঠিকানাটা বরং ডেসপ্যাচারের কাছে রেখে দিয়ো। যদি কখনো দরকার হয়—"

একান্ত স্বাভাবিক স্বরে ডাউলিং বলল, "তার আর দরকার হবে না, সার। আমার ঠিকানা ওই গ্রাণ্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাটই।"

আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতে ডাউলিঙেরও মনে হোলো যে, একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। তাই যোগ করল, "পেগী এ্যাণ্ড রবিনসন ওয়্যার বোথ ভেরি রিজনেবল এ্যাবাউট ইট অল। আমাকে ওরা বলেছে, ওদের সঙ্গে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে। রিপন স্ট্রীটের বোর্ডিং হাউসে মাসে দেড়শো লাগত। এখানে আমি ওদের দিচ্ছি পঁচাত্তর। এইটেই ভালো বন্দোবস্ত, তাই নয়? দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট ইন গেটিং টু একসাইটেড এ্যাবাউট স্মল থিংস, সার, ইজ দেয়ার?"

আমি সম্মতি জানাবার আগেই ডাউলিং বিদায় নিল।

আমার সেই মহান্ বিরহের গল্প আজো লেখা হয়নি।

# শেষ কথা

"I do not write as I want to ; I write as I can". সাধ ও সাধ্যের মধ্যে এই দুস্তর দূরত্ব শুধু সমরসেট ম'মের সম্বন্ধে সত্য নয়। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে যে বৃহৎ কালো ছায়া পরিব্যাপ্ত তার দ্বারা প্রতি সচেতন লেখকের মন সদা আচ্ছন্ন। যার ভাব আছে তারই কবুল করতে হয়, 'ভাব কেঁদে মরে, ভাঙা ভাষা।' সব লেখকের শ্রেষ্ঠ কল্পনা তাই অলিখিত : প্রকাশিত রচনায় সে কল্পনার আভাসমাত্র পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন।

কিন্তু পড়বার বেলায় লেখকের শক্তির পরিমিতির কথা আমি আদৌ স্মরণে রাখিনে। তখন আমি দাবী করি ঠিক যেমনটি আমার রুচি। আমার সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যে গল্পলেখক আমায় গল্প দিতে অক্ষম তাঁর লেখা আমি কষ্ট করে পড়িনে। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে আমার মনোমত লেখককে সাদরে অভ্যর্থনা জানাই, সাগ্রহে তাঁর বই পড়ি।

ছোটোগল্প সম্বন্ধে আমার প্রথম দাবী এই যে তা গল্প হবে। কথাটা বীরবলী অর্থে বলিনি, বলেছি এই কথা বোঝাতে যে আমার মনের মতো গল্পে কিঞ্চিৎ ঘটনা থাকা চাই ; সে ঘটনার বর্ণনে গতি চাই, চাই পরিণতি আর ক্রমবিকাশ। যে গল্পের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণ নায়ক শুধু একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে তাঁর দুঃখের কথা ভাবেন, বা বিধুরা নায়িকা জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বিশেষ কিছু না ভেবে এবং

একেবারেই কিছু না করে খাঁচার পাখিটিকে খাবার দিয়ে গল্প শেষ করেন—তেমন কাহিনীতে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ থাক, গভীর জীবনদর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা থাক, আমি তা পড়তে পারিনে। আমার পছন্দের গল্পের একটা স্থরু থাকা চাই, একটা অন্তরা থাকা চাই, এবং সঙ্গত একটা সমাপ্তি থাকা চাই। সমাপ্তির সঙ্গতিকে ব্যাহত না করে যদি তার উপব একটু বিস্ময় পাই তাহলে লেখকেব উপর আমি আবো খুশী হই।

সেই বিস্ময়টি কিন্তু শেষে আসা চাই, স্থরুতে নয়। অস্কার ওয়াইলডের কোন নাটকে যেন একটি চরিত্র বলছে যে নৈশ ভোজন হচ্ছে পবিহাসের প্রশস্ত লগ্ন, প্রাতবাশে পরিহাস অসহ্য। ছোটোগল্পের বিস্ময়ও তেমনি সমাপ্তিতেই বিধেয়।

অথচ আমাব গল্পেব একমাত্র বিস্ময় স্থরুতেই নিবেদন না করে উপায় নেই। একদিন সত্যি আমি বেলা দেড়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড হোটেলেব এম্ব্যাসি বারে বসেছিলুম—তবু তিন গেলাস নেবুজলের চেয়ে উত্তেজক কোনো পানীয় স্পর্শ মাত্র করিনি!

তার কাবণ ছিল। তখন আমি প্রেমে বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাস করতুম মানে না করে উপায় ছিল না। আমাব সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রের সাক্ষ্য আমি অস্বীকাব করব কী করে? তখন আমি রাত্রে ঘুমুবাব আগে একজনের কথা স্মরণ করতুম, আবার ঘুম ভাঙতো তারই স্মরণের সঙ্গে। এমন যে 'শয়নের শেষ চিন্তা, প্রভাতের প্রথম ভাবনা' প্রেম ছাড়া তার দ্বিতীয় নাম নেই এবং তেমন প্রেম অস্বীকার করা শুধু সাধ্যের অতীত নয়, কামনা ও কল্পনারও বাইবে। যে ব্যক্তি তখন আমার হৃদয় এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছিলেন, তিনি বলতেন আমিও নাকি তাঁর সমগ্র সত্তা ঠিক তেমনি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন

করেছিলুম। এমন পারস্পরিক প্রেমের প্রগাঢ় প্রশান্তিতে উত্তেজনার স্থান কোথায়? ভালোবেসে যে ভালোবাসা পেয়েছে তার হৃদয় তো এমনিতেই পূর্ণ, সে কেন উত্তেজনা কিনতে যাবে এ দোকান থেকে ও দোকানে? জাগ্রৎ সত্তা তেমন ভাগ্যবানের কাছে যখন এমন মধুর, তখন তার তো পলায়নের প্রয়োজন নেই ওই সত্তা থেকে আসবের সহায়তায়।

এম্ব্যাসিতে সেদিন যে-আমি বসেছিল সে-আমি তেমনি ভাগ্যবান ছিল। তাই পানমত্ত পরিবেশ আমায় সেদিন বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ করেনি। এমনকি বন্ধু ডক্টর ঘোষের দৃষ্টান্তসমেত উপরোধও বহুবার শুনে শুধু স্মিতহাস্যে বলেছি, "আজ খাব না। না খেয়ে এমনিতেই ভালো লাগছে।"

ডক্টর ঘোষ রোগী-দেখা ডাক্তার ন'ন। ইতিহাসের ছাত্র। কলকাতার কোন বেসরকারী কলেজে কিছু দিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। কিন্তু গাম্ভীর্যের মুখোশ প'রে ছাত্রদের ভক্তি আদায় করতে তাঁর রুচি ছিল না। তাই অল্পকালের মধ্যেই লেক্‌চারশিপে ইস্তফা দিয়ে এমন পেশায় নাম লিখিয়েছিলেন যেখানে শান্ত বা সম্ভ্রান্ত হবার দায় নেই: অর্থাৎ সাংবাদিক হয়েছিলেন। তার পর থেকে গত বিশ বছর সেই কাজেই নিযুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে। কেউ কেউ বলেন যে তিনি বড়ো বেশি পণ্ডিত, সাংবাদিকতায় পাণ্ডিত্য অবান্তর। অপর পক্ষ বলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য পুঁথিগত। বাইরের জীবন্ত জগতের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ নেই। সে যাই হোক, সাংবাদিক মহলেও তিনি ডক্টর ঘোষ বলেই পরিচিত, আজো কেউ তাঁকে মিস্টার ঘোষ বলেন না—না এদেশে, না ওদেশে। বরং কেউ কেউ ঘোষ-ও বলেন না, শুধু বলেন, 'হ্যালো ডক্টর!'

এহেন ডক্টর ঘোষ আমার পানে নিরাসক্তির কারণ বিশ্লেষণ করে সশ্লেষে এবং সবিস্ময়ে বললেন, "ডোণ্ট টেল মি যু হ্যাভ ফল্‌ন্‌ ইন লভ্‌!" যেন কোনো থানায় পড়া এর চেয়ে কম লজ্জাকর।

"গুড্‌ গড্‌ নো!" আমি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে অস্বাভাবিক প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিলুম, কেননা আমার আর —র প্রেম বাইরের কাউকে জানাবার নয়। সে শুধু আমাদের দু'জনের অন্তরের নিভৃততম গোপন কথা। তৃতীয় কারো তা জানতে চাইবারও অধিকার নেই। আমরা নিজেদের মধ্যেও মুখ ফুটে কখনো সেকথা বলিনি। অকথিত অনুভূতি উভয়েব অন্তরে মথিত হয়ে দু'টি চিত্ত অনুক্ষণ অমৃতধারায় সিক্ত করেছে, প্রকাশের অশ্লীলতায় সে অনুভূতিকে কখনো মলিন হতে দেয়নি। কারো কাছ থেকে কিছু লুকোবার জন্যে নয়, কেউ কিছু মনে করবে বলে নয়। অমনি। ফুল যখন ফোটে তখন তাকে বট্যানি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে সেকথা জানাতে হয় না সবাইকে। সে যে ফুটেছে সেইটেই যথেষ্ট। আমাদের প্রেম ছিল তেমনি। কাবো কাছে তা ঘোষণা করবার আমাদের দায় ছিল না।

ঘোষ তাঁর তৃতীয় ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা শেষ কবে পরম স্বস্তির সঙ্গে বললেন, "হ্বাট'স বেটার। প্রেম হচ্ছে হামের মতো, ও ব্যাধি ছেলেবেলায়ই শোভা পায়। বয়স হলে ওটা মারাত্মক। তার চেয়ে, ওই যে কিপলিং যা লিখে গেছেন:

I've taken my fun where I've found it ;
    I've rogued an' I've ranged in my time
I've 'ad my pickin' o' sweethearts,
    An' four o' the lot was prime. এট সেটেরা,

এট সেটরা। হ্যাঁ, তারপর আর যেন কী আছে, ও ইয়েস, মনে পড়েছে:

An' the end of it's sittin' and thinkin',
An' dreamin' Hell-fires to see;
So be warned by my lot (which I know you will not),
An' learn about women from me!"

প্রেম যার কাছে অতীতের মৃত স্মৃতি নয়, বর্তমানের জীবন্ত উপলব্ধি, তার কাছে এসব উপদেশামৃত ব্যর্থ হতে বাধ্য। তা সে কিপলিংই বলুন আর যে-ই বলুন, আর সেকথা ডক্টর ঘোষ যতই নিখুঁত অশালীন কিন্তু মিষ্ট ককনি উচ্চারণে আবৃত্তি করুন। প্রত্যেক প্রেমিক অন্তত এক সহস্র ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী পড়েছে বা শুনেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে, তবু তা থেকে কোনো সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করবার কথা তার কখনো মনে হয় না। যদিবা সে সাধারণ নিয়ম হিসাবে একথা মেনে নেয় যে প্রেমে সাফল্যের বা সার্থকতার চেয়ে ব্যর্থতার সম্ভাবনা অধিক, তবু সে বিচলিত হয় না। সে জানে সে কোনো নিয়মের দাস নয়, তার নিজের প্রেম তেমন কোনো আইনের অধীন নয়, তার নিজের প্রেম সব নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। ব্যর্থতা সেখানে অবাঞ্ছনীয়, তাই অভাবনীয়, তাই অসম্ভব।

তাই সেদিন ঘোষের কথা আমায় বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। আমি তখন সকল সংশয়ের অতীত স্বপ্নের স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী। হেসে বললুম, "তাই নাকি?"

ঘোষ বললেন, "ইক্স্যাক্ট্লি।" আমার সন্দেহ হোলো, কথাটা যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলা। তাই বুঝি ঘোষ আবার বললেন, আরো জোর দিয়ে, "আব্সল্যুট্ম।"

পৃষ্ঠা ছয়

ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল লণ্ডনে, ফ্লীট স্ট্রীট অঞ্চলে চেশায়ার চীজ নামক প্রসিদ্ধ পেয়াবাসে। ঘোষ সেদিন একা ছিলেন না, তবু একজন ভারতীয়কে একাকী দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। পরে তাঁর সঙ্গে আরো দেখা হয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক জেনেছি, বন্ধুতা হয়েছে, তাই দেশে এসে আমাকে খবর দিয়েছেন। তবু সেই প্রথম সাক্ষাতেব কথা মনে কবে বললুম, "আচ্ছা, আপনার সেই সুন্দরী সঙ্গিনীটির কী খবর বলুন তো?"

ঘোষ বললেন, "কার, ফ্লরেন্সেব কথা বলছ?"

আমি বললুম, "না, ওই যে—"

আমাকে শেষ করতে না দিয়ে ঘোষ বললেন, "ও বুঝেছি, ঈভলিনের কথা বলছ। তা ও—"

এবারে আমায় বাধা দিয়ে বলতে হোলো, "না, তার নাম ঈভলিন নয়, আমি বলছিলুম—"

ঘোষ কিছুতেই আমার কথা শেষ হতে দেবেন না, বললেন, "এবার বুঝেছি, বার্থা হোপের কথা বলছ। শী ইজ এ স্লাট। তার কোনো খবর জানিনে। আই সাপোজ শী ইজ নাউ হোয়্যার শী অলওয়েজ বিলংড্। পিকাডিলির কাছাকাছি কোনো রাস্তায় গেলে হয়তো তার শিস শুনতে পাবে প্রত্যেক সন্ধ্যায়!"

এবাবে আমার জেরা আমায় প্রত্যাহার কবতে হোলো। আমার আজো মনে আছে, ঘোষ চেশায়ার চীজে যে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তার নাম ছিল রোজ্ ল্যামিংটন, বি-বি-সিতে কাজ করতো, কোন টক্‌স্ প্রোডিউসারের সেক্রেটারী ছিল।

আমার এত বৃত্তান্ত মনে ছিল, যদিও দেখা হয়েছিল মাত্র একবার। কিন্তু ঘোষ তার নামটা পর্যন্ত মনে রাখেননি। তার বদলে ঘোষ যে ইতিমধ্যে ফ্লরেন্স-ঈভলিন-বার্থা ইত্যাদি এত জনের সখ্য লাভ করেছেন তাতে আমি মৃদু ঈর্ষা অনুভব করলুম, কিন্তু একথাটা ভাবতে ভালো লাগল না যে রোজ্ ল্যামিংটন কোথায় ঘোষের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাকে একবার মাত্র দেখেছি তাকে এমন ভাবে বিদায় দেয়া বড়ো বেদনাদায়ক।

কিন্তু আরো খারাপ লাগছিল ঘোষের কথা ভেবে। এ জীবনে আর বেচারীর স্থিতিলাভ ঘটল না। কখনো কাউকে মন দিল না, তাই কারো মন পেল না। আজ এর সঙ্গে কাল ওর সঙ্গে, এমনি করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিল। কারো প্রেমের উপর ও নির্ভর করতে পারল না, কেননা ওর প্রেমের উপর কোনো মেয়ের নির্ভর করবার উপায় ছিল না। যাকে যা দেব, তার কাছ থেকে তাই পাব, তার এক কণাও বেশি নয়। ঘোষের জন্য আমার অনুকম্পার অন্ত ছিল না। ও কাউকে কিছু দেয়নি, সবায়ের কাছ থেকে সব কিছু আশা করেছে। পায়নি বলে অপর পক্ষকে অভিশাপ দিয়েছে : একবারও নিজের মনে এমন সন্দেহের স্থান দেয়নি যে ঘোষেরও কিছু দোষ থাকতে পারে।

আমি এসব কথা ভাবছিলুম আমার তৎকালীন প্রেমময়তার শান্ত পরিপ্রেক্ষিতে। আমি প্রেম পেয়েছিলুম, কেননা আমি প্রেম দিয়েছিলুম। 'সেই যে আমার চেয়ে আমি, ছিল সবার চেয়ে দামী, তারে উজাড় করে সাজিয়েছিলেম তোমার বরণডালা।' এমন সব না দিলে কি সব পাওয়া যায়? আমি —র কথা ভাবছিলুম। মনে মনে তার স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করছিলুম। ঘোষকে মনে হচ্ছিল নীচের কোনো জগতের হতভাগ্য অভিশপ্ত অধিবাসী

বলে। বেচারী! নিজের মধ্যে শান্তি নেই, কেননা নিজকে আর কারো হাতে সঁপে দেয়নি। নিজকে তাই মনে হয় ভয়ানক একটা বোঝা। তাই বেচারীকে অত্যধিক মদ্যপানের পলায়নপরা উত্তেজনা ধরে রাখতে হয় অধিকতর মদ্যপানে। বেচারী সর্বক্ষণ কথা না বলে পারে না, কেননা কথা থামালেই ভাবনার সুরু—যে ভাবনায় শান্তি নেই!

আমি লঘু আলোচনার রসদ জুগিয়ে বললুম, "কিছু দিন আগে কলকাতায় একটা ছবি হয়ে গেছে। 'মেন ইন মাই লাইফ্।' আপনি আপনার আত্মজীবনী লিখুন, নাম দিন 'উইমেন ইন মাই লাইফ্'।"

ঘোষ হেসে বললেন, "তা মন্দ বলোনি। লিখব। হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সেদিন কোন একটা দোকানে একটা বই দেখছিলুম, নাম Written with Lipstick. আচ্ছা, আমার আত্মজীবনী কী দিয়ে লিখব বলো তো? লিপস্টিক দিয়ে না কলম দিয়ে?" ঘোষ আবার সশব্দে হাসলেন।

আমি বললুম, "কিন্তু আপনি লিখবেন কী করে? আপনার তো বেশির ভাগই মনে থাকে না। নায়িকাদের নাম পর্যন্ত ভুলে যান। এমন ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি নিয়ে লিখতে বসলে তো সব বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হবে এবং সে লেখা আমাদের আর সবায়ের বানানো লেখার মতোই বাজে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শযোগ্য উষ্ণতা সে রচনায় আসবে না তো!"

"না, না, সব ভুলে যাই নে। অস্পষ্টভাবে অনেক কিছু মনে থাকে। বিভিন্ন মেয়ের বৈশিষ্ট্য মনে থাকে না, এই বলবে তো? আই হ্যাভ গট দি বেস্ট আনসার টু দ্যাট। মেয়েদের বৈশিষ্ট্য আমার মনে থাকে না কেননা তাদের বৈশিষ্ট্য বলে কিছু নেই। সব সমান, অ্যাট লিস্ট ইন

ফাণ্ডামেণ্টালস।" ঘোষ তাঁর নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেই খুব হাসছিলেন।

আমার এ কথাগুলি ভালো লাগছিল না। কথাগুলি পুরানো, ওদের এককালীন চতুরতার উপর পর্যন্ত মরচে পড়েছে কয়েক ইঞ্চি। তাছাড়া এই অগভীর সিনিসিজম আমার তীব্র অশ্রদ্ধার বস্তু। মতামতের প্রশ্ন বাদ দিলেও, আমার বিরক্ত হবার তখন ব্যক্তিগত অনেক কারণ ছিল। আমি তখন এমন একজন মেয়েকে জানতুম যে ছিল একান্তই বিশিষ্ট। লক্ষ মেয়ের ভীড়ে তাকে আমি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে অনায়াসে খুঁজে বের করতে পারতুম। তার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কাজে, তার ব্যক্তিত্বের নির্ভুল প্রতিফলন ছিল; সমগ্র স্ত্রীজাতির অন্য কারো সঙ্গে তাকে আমি কখনো ভুল করতে পারতুম বলে বিশ্বাস করিনে। অন্ধ হোলেও তার উপস্থিতি আমি অনুভব করতে পারতুম আমার প্রতি তন্ত্রীতে, বধির হোলেও তার কথার অনুরণন আমার প্রাণে অশ্রুত থাকতো না। সে মেয়ে সত্যি অনন্যা ছিল।

আর ঘোষ বলেন কিনা ওঁর কোনো মেয়ের কথা মনে থাকে না কেননা মনে রাখবার মতো বৈশিষ্ট্য কারো নেই! এ কী অবিশ্বাস্য অন্ধতা যা সব কিছুকে, সব কাউকে, বৈচিত্র্যহীন ও অভিন্ন করে দেয়? তবু ঘোষের সঙ্গে গুরু আলোচনায় আমার অভিরুচি ছিল না। গুরু আলোচনা করবার মতো ওঁর অবস্থা ছিল কিনা তাও নিঃসন্দেহ নয়। আমি শুধু বল্লুম, "আপনি বিশ বছর বিলাতে থাকলে কী হবে, পুরোপুরি বাঙালী রয়ে গেছেন!"

"অর্থাৎ?"

"মানে, 'সব মেয়েই সমান' বা ওই রকম নামের কী যেন একটা বাঙলা

বই বেরিয়েছিল কয়েক বছর আগে। কোনো অর্ধশিক্ষিত বাঙালীরই লেখা। আপনার কাছ থেকে ওই রকম অর্বাচীন কথার প্রতিধ্বনি আশা করিনি।"

ঘোষ আমার তিরস্কারে খুশী হোলেন না। আরো একটা ব্র্যাণ্ডি চাইলেন। আবার আমাকে অনুরোধ করলেন আমার অপান-প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করতে। আমার অস্বীকৃতিতে আবার হাসলেন। বিরতির পরে বললেন, "অদ্ভুত, তাই নয়, যে আমি এত অভিজ্ঞতার পরে ঠিক সেই সিদ্ধান্তে পৌছোলুম যা অর্ধশিক্ষিত কোন বাঙালী লেখক বহুদিন আগে জেনেছে, যে সে সিদ্ধান্ত তোমার মতো স্বল্পাভিজ্ঞর কাছে পর্যন্ত অর্বাচীন মনে হোলো? মানুষের জ্ঞান বোধহয় সত্যি সার্ক্যুলার, বৃত্তাকার; তা নইলে যেখান থেকে যাত্রার স্বরু ঠিক সেখানেই যাত্রার শেষ হয় কী করে!"

আমার উক্তিতে ঘোষ আহত হয়েছেন। আমাব কথা আমি ফিরিয়ে নিলুম না, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে বললুম, "ঠিক তা নয়। আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার কী মনে হচ্ছিল জানেন? আমি ভাবছিলুম যে আপনিও আর-সব সীনিকেরই মতো: বর্ণচোরা রোম্যান্টিক। আপনাদের ক্রুদ্ধ বিদ্বেষের উপর আস্তে একটু নখের আঁচড় পড়লে তৎক্ষণাৎ শুধু রোম্যান্টিসিজম নয়, স্ত'লো সেন্টিমেণ্টালিটির বন্যা বইবে। আসলে আপনারা মানুষের নানা খুঁত দেখে অত জোরে হাসেন এইজন্যেই যে কান্না স্বরু না হয়। যারা প্রকাশ্যে সারাক্ষণ কাঁদছে আপনারা গোপনে তাদের চাইতে বেশি কাঁদেন।"

হঠাৎ ঘোষ গম্ভীর হয়ে গেলেন। সামনের গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুললেন, গ্লাস দিয়ে যাতে মুখটা ঢাকা পড়ে। যেন আমি তাঁর মুখ দেখতে না পাই, মুখ দেখে যেন আমি তাঁর মনের অবস্থা অনুমান করতে না পারি। ঘোষ যেন ধরা পড়ে গেছেন, তাঁর সিনিসিজমের মুখোশ যেন হঠাৎ খসে পড়েছে।

কিন্তু ঘোষের এই বিব্রত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোষ বললেন, "তোমাদের আত্মতৃপ্তি দেখে হেসে বাঁচিনে! চোখের সামনের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে তার অন্তরালে ঈপ্সিত কতগুলি পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা আরোপ করে এই আনন্দে আছো যে ওই করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর স্বরূপ জেনেছ। আমি কিনা রোমান্টিক, আমার এই বুড়ো বয়সে, জীবনের এত অভিজ্ঞতার পর! ফ্যান্সি গ্যাট, কলিং মি এ সিলি রোম্যান্টিক! হোয়াই, যু কুড অ্যাজ স্যুন কল মি এ হিপোপোটেমাস্! হা—হা—বাই গড্! ইফ্ দিস ইজন'ট ফানি, আই ডোণ্ট নো হোয়াট ইজ। অনেস্টলি আই ডোণ্ট! আই উইল বি ড্যাম্‌ড্, মি এ রোম্যান্টিক; হোয়াই—"

ঘোষ এত জোরে হাসছিলেন, এবং সেই সঙ্গে চলতি ইংবেজি বুলিতে এসব কথা বলছিলেন যে অবৃহৎ এম্ব্যাসি বারের অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকরাও তা শুনে দুয়েকবার ঘোষ ও আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি তাই ঘোষের হাসি থামাবার জন্যেই বললুম, "বয়স হোলেই যে রোম্যান্টিসিজম সেরে যায় এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই কিন্তু।"

ঘোষ হাসি থামিয়ে আবাব হঠাৎ গম্ভীব হয়ে বললেন, "তা ঠিক বলেছ। ও ব্যাধি অপেক্ষাকৃত অল্প বযসেই কাটিয়ে না উঠলে—যেমন আমি কবেছিলুম —পরে আর ছাড়তে চায় না। তখন যু মেক এ ফুল অব য়োর্‌সেলফ্।" ঘোষের এই শেষ কথাটায় অবিশ্বাস্য তীব্রতা ছিল।

একটু থেমে ঘোষ আবার সুরু করলেন, "ও ইয়েস, দ্যাট'স হোয়াট যু ডু, যু মেক এ সিলি আ—স্ অব য়োরসেলফ, হোয়াইল এভরিওয়ান লাফস হিজ হেড অফ! হোয়াই, আই লাফ্ অ্যাট দি ফুল মাইসেলফ্!"

এশ্যাসির অন্যান্য গ্রাহকরা অধিকাংশই ইংরেজ ছিলেন, অন্তত অবাঙালী। তাই ঘোষ তাঁর সব কথা বাঙলায় বললে কেউ হয়তো গ্রাহ্য করতো না। কিন্তু ইংরেজিতে, এবং খুব আস্তে না, বলাতে আমরা ওদের অবাঞ্ছিত দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলুম। একেবারে ইংরেজি কথা ব্যবহার না করে বাঙলায় কেউই আমরা কথা বলিনে, চেষ্টা করলেও বলতে পারিনে—যাঁরা ইংরেজি ভালো জানেন না তাঁদের বেলায় কথাটা আরো বেশি প্রযোজ্য—তবু আমি অনুনয় করে ঘোষকে বললুম, "প্লীজ, বাঙলায় বলুন, আর সবাই শুনছে।"

ঘোষ বললেন, "আই কুডন'ট কেয়ার লেস্‌। যাক, তবু যতটা পারি বাঙলায় বলি।" একটু থেমে বললেন, "না, তোমার ওই কথায় আমার এক নির্বোধ বন্ধুর কথা মনে পড়ছিল। প্রায় আমার বয়সী। দেখেছে, শুনেছে, ঘুরেছে অনেক। বিভিন্ন দেশের মেয়েদের তুলনামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনতে চাও তো আমার ওই প্রিয় বন্ধুটির কাছে যাও। শুধু য়ুরোপ নয়, ফার ঈস্ট আর আমেরিকাও বাকি রাখেনি। আর মেয়েদের সঙ্গে নিমেষে বন্ধুত্বস্থাপনের প্রতিভা আছে ওর।

"দেখতে ভালো, হাত দেখতে জানে, হাল্কা গল্প বলতে পারে হাজারে হাজারে, গুটি ষোল ভাষায় বলতে পারে 'আমি তোমায় ভালোবাসি', ভালো নাচে, ফরাসি মেয়েদের ইংরেজি গান শোনায় আর ইংরেজ মেয়েদের জর্মান, জানে সুন্দরীকে বুদ্ধিমতী বলে প্রশংসা করতে হয় আর বুদ্ধিমতীকে সুন্দরী বলে, ধনিসান্নিধ্যে ও কম্যুনিস্ট আর কম্যুনিস্টকুলে ও ব্যক্তিস্বাধীনতা-প্রিয়, আদর্শবাদিনীদের সমাজে ও একসিস্‌টেন্‌শিয়ালিস্‌ট্‌ বলে পরিজ্ঞাত আর প্যারিসে গেলে ও পাকা এম্‌পিরিসিস্‌ট্‌ : মোদ্দা কথা, যারা ম্যাচ্‌ করে পোষাক করে আমার বন্ধু তাদের দলে নয়, ওর মানসিক পোষাকের তুরুপ

হচ্ছে যাকে মেয়েরা পোষাকী পরিভাষায় বলে কন্‌ট্রাস্‌ট্। কিন্তু এমন মেয়ে জানিনে যে আমার বন্ধুকে উপেক্ষা করতে পারে। অনেকে ওকে ভালো-বাসে, সবাই ওকে পছন্দ করে।"

আমি বললুম, "তাহলে ঠিক আমার বিপরীত বলুন। দৈবাৎ কেউ কখনো কিছুক্ষণের জন্য আমায় ভালোবাসে, আর সবাই আমার বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী ঘৃণা পোষণ করে।" কথাটা পুরোপুরি কপট বিনয় থেকে বলা নয়। যদিও আমার মনে তখন নিশ্চয়ই এমন ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে আর যেই আমার প্রতি মাত্র সাময়িকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন হোক, আমার — কখনোই আমায় ভুলবে না, যেমন আমি তাকে ভুলব না।

ঘোষ কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাতও করলেন না। তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর নিজের চিন্তায়। তিনি ভাবছিলেন তাঁর হতভাগ্য নির্বোধ বন্ধুর কথা। ঘোষ বললেন, "আমার বন্ধুর নাম বলব না, তুমি তাকে চেন না কিন্তু তার কথা জানো। এদিকে বারবার 'আমার বন্ধু' বলাও অসুবিধা। হিয়ারিন-আফটার ওর নাম দেওয়া যাক—কী নাম দেব ? —লেট'স সে, সুরেন্দ্রনাথ, সুরেন ফর শর্ট। এহেন সুরেন কিছুদিন আগে দেশে ফিরেছিল। দেশে ফিরে বিলেত-ফেরৎ ফ্রেটারনিটির সঙ্গে দেখা করল একবার কি দু'বার। তারপর ওর সব বন্ধুরা অবাক্, আর কোনো খোঁজ নেই সুরেনের ! বাড়িতে টেলিফোন করলে পাওয়া যায় না, চিঠি লিখলে তার প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত মেলে না। লণ্ডনে ও প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রসমাজের সঙ্গে ওর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল; অরবিন্দ সোসাইটি বা রবীন্দ্রসমিতির লণ্ডনের অফিস তো রাসেল স্কোয়ারের ছোটো একখানা ঘর, কিন্তু দেশের কাগজে তার খবর ছাপা চাই তো ফলাও করে, তাই এসব উৎসাহীদের সুরেনের শরণাপন্ন হতে হোতো।

তারাও সবাই কলকাতায় সুরেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। কিন্তু সুরেন নিরুদ্দেশ। লণ্ডনের সে-সব সভায়, বিশেষ করে লণ্ডন মজলিসে, যে মেয়েরা গান গাইতো তারাও সুরেনকে খুঁজছিল: আবার একটু বিলাতের কথা ক'য়ে বর্তমান পরাধীনতার জীবন নিয়ে বিলাপ করতে। সুরেন তাদেরও কারো সঙ্গে দেখা করেনি। মোদ্দা কথা, কলকাতার সবাই জানতো যে সুরেন কলকাতায়, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হোতো না কারো।

"বলা বাহুল্য, এই পুরো ব্যাপারটাই সুরেনের স্বভাববিরুদ্ধ। ও সঙ্গকামী। নিজের সঙ্গ অর্থাৎ নিঃসঙ্গতা ও সহ্য করতে পারে না। সবাই জানে, ওর মতো একসট্রোভার্ট কখনো একা থেকে শান্তি পায় না, ভীড়ে ও প্রাণ পায়, নইলে মনমরা। তবু সুরেন এমন সবায়ের সঙ্গ এড়িয়ে কী খুঁজে বেড়াচ্ছে কলকাতায়?

"কিছুদিন বাদে জানা গেল। কেউ জানতো না, কাউকে কখনো বলেনি, বিলেত যাবারও আগে, সে আজ বছর পঁচিশ আগেকার কথা, সুরেন একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। এই কলকাতারই মেয়ে। সুরেনের বিলেত যাবার আগে থেকেই সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কী করে প্রেমের সমাপ্তি ঘটেছিল বলা শক্ত। সুরেন নিজেও জানে না, কেননা মেয়েটি জানায়নি।"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "হ্যাট'স ফানি। রাশিয়াও তো অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করবার আগে কারণটা জানিয়ে দেয়।"

"ঠিক তাই। কিন্তু পুরুষরা আর ডিপ্লমেসির কতটুকু শিখেছে! মেয়েদের ও বিদ্যা শিখতেই হয় না। তাই সরলা—" (হঠাৎ ঘোষ যেন একটু বিব্রত হোলেন, একটু থেমে বললেন, "এ-এ, লেট'স গিভ হার· হ্যাট সিম্পল অ্যাণ্ড

ওল্ডফ্যাশনড নেম্") —"হ্যাঁ, সরলা সেদিন সুরেনকে যা বলেছিল তার চেয়ে ডিপ্লম্যাটিক কিছু আমি ভাবতে পারিনে। বলেছিল, 'কেন যে শেষ করে দিচ্ছি তা তুমি ভালো করেই জানো।' সুরেন সত্যি কিছু জানতো না, ওর প্রেমের এমন আকস্মিক সমাপ্তি ও কল্পনাও করেনি, তার কারণ সন্ধান করা তো দূরের কথা। সুরেন জানাল সে কথা সরলাকে। সরলা খোলা জানলাটার ধারে দাঁড়িয়েছিল। তার উদাসী দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাইরের শরতের স্বচ্ছ আকাশের দিকে। হাতের চিরুণীটা দিয়ে আস্তে আস্তে চুল আঁচড়াচ্ছিল। ডান হাতের কনুইটা ভর করেছিল জানলার একটা শিকের উপর। তার ডান পা সে চটি থেকে বের করে মেঝের উপর পায়ের আঙুল দিয়ে কী লিখছিল বা আঁকছিল। অযত্নে পরা শাড়ির আঁচলটা জানলা-দিয়ে-আসা মৃদু হাওয়ায় একটু দুলছিল। সুরেন বসে বসে এত সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছিল, কিন্তু সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাবের অস্পষ্টতম আভাসও অনুমান করতে পারেনি। অনেকক্ষণ এমনি নীরবতার পরে সরলা বলল, 'তা যদি না জানো, সুরেন, তাহলে আমার পক্ষে সেকথা জানাবার চেষ্টা করা বৃথা।' দ্যাট ওয়াজ অল। টেল মি, কুড এ ডিপ্লম্যাট হ্যাভ ইমপ্রুভড অন্ দ্যাট ওয়ান? সুরেনের প্রশ্নের উত্তর একটা দেয়া হোলো, কথাটা শুনতেও মন্দ নয়, একটু ভাবের আমেজ আছে, অথচ ভাবখানা যে কী তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত অপর পক্ষ আন্দাজও করতে পারল না। সরলার উপর সুরেন রাগ করতে পারল না—কই, রাগ করবার মতো রূঢ় কিছু সে বলেনি তো! আত্মসংশোধনের চেষ্টাও বৃথা—কেননা কোথায় ত্রুটি হয়েছে তা তো বলা হয়নি। অথচ এর পরে সরলাকে সুরেন ভালোবাসে কী করে? রেসিপ্রসিটি বাদে প্রেম কাব্যে মন্দ নয়, জীবনে অসম্ভব। অমন

একৃস্‌-পার্টে সম্পর্কের নাম আর যাই দাও, দোহাই তোমার, প্রেম নাম দিয়ে তাকে বিড়ম্বিত কোরো না। সুরেন সেই সমস্যায় পড়ল।"

ঘোষ থামলেন গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য। আগেই বলেছি, সেদিনকার পানোৎসবে আমি পার্টিসিপ্যাণ্ট ছিলুম না, ছিলুম অবজার্ভার। তাই ঘোষের উপর কোহলের প্রসরমান প্রভাব দর্শকের মতো লক্ষ্য করতে পারছিলুম। ঘোষ ইতিমধ্যেই বেশ সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বাচনেও কিছু জড়তা কিছু অসংলগ্নতা এসে গিয়েছিল। একেবারে প্রকৃতিস্থ লোকের চোখে দৃশ্যটা মনোরম নয়। আমার এ কথা ভাবতেও খারাপ লাগছিল যে অন্যান্য অনেক সময় আমিই অমন বিরক্তিকর দৃশ্য হয়েছি নানা জানা-অজানা প্রকৃতিস্থ লোকের উপস্থিতিতে। আমাকে দেখেও কেউ কেউ গোপনে হেসে থাকবে, করুণার চক্ষে দেখে থাকবে—যেমন আমি ঘোষকে দেখছিলুম। এই কারণেই ঘোষের জন্যে আমার সহানুভূতি বাড়ল। বললুম, "তা ঠিকই বলেছেন।" ঘোষের গল্পের নায়ক আসলে কে সে সম্বন্ধে আমি ইতিমধ্যেই সন্দিহান হয়েছিলুম। তবু সন্দেহ গোপন করে বললুম, "তারপর আপনার বন্ধু সুরেন কী করলেন?"

ঘোষ বললেন, "হি ওয়াজ রাদার লাকি। ওই অস্বস্তিকর, প্রায় অসহ্য, প্রায় অসমাপ্ত সমাপ্তির দিন কুড়ি পরেই সুরেন বিলেত চলে গেল। দু'জনের মধ্যে রইল ওই সাত সমুদ্র আর তেরো নদী।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সরলা জানতো সেকথা? না কি—"

"আই ডোণ্ট নো। সরলা জানতো কি না জানিনে। কিন্তু সুরেন লয়েড ট্রিয়েস্ট্রিনোর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিলীয়মান বম্বের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবছিল, সরলা যদি খবরটা পেয়ে থাকে তাহলে হয়তো সে স্বস্তির

নিশ্বাস ছেড়ে শুধু বলছে, বাঁচা গেল, আপদ গেল! সুরেনকে একটু আগে ভাগ্যবান বলছিলুম, কিন্তু তখন সেকথা তার নিজের মনে হয়নি। তার শুধু মনে হচ্ছিল যে তার পরম আকাঙ্ক্ষিতের কাছে সে এমন অবাঞ্ছিত! যে তার বিদায় সরলার কাছে আপদ বিদায়!"

আমার ভুল হয়ে থাকবে, কিন্তু ঘোষ তাঁর বন্ধু সুরেনের কাহিনী এমন স্বচ্ছ অনুভূতি ও আন্তরিক বেদনাবোধের সঙ্গে বর্ণনা করছিলেন যে তাঁর বন্ধু-প্রীতিতে আমি মুগ্ধ হলুম। বন্ধুর বেদনা এমন নিজের করে নিতে আমরা ক'জন পারি? আমি বললুম, "আপনি যা সিনিক, আপনার গল্পের শেষ নিশ্চয়ই এই যে সুরেন বিলেতে গিয়ে সহস্র মেয়ের সঙ্গে প্রেম করল, কখনো কিছুদিনের জন্যে দুয়েকটিকে বিয়েও করে থাকবে বা, তারপর অনেক বছর পরে যখন সে কলকাতায় ফিরল তখন হঠাৎ কোনো বন্ধুর বাড়িতে সরলার সঙ্গে তার দেখা হোলো, অথচ সুরেন সরলাকে চিনতেও পারল না, সরলাও সুরেনকে চিনল না, আর তারপর সদ্য আলাপিতের মতো দু'জনে মিলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা সুরু করল। অতএব প্রেম নেই, Q.E.D."

ঘোষ হেসে বললেন, "আমিও ঠিক তাই আশা করেছিলুম। আফটার অল, টুয়েন্টি ইয়ারস ইজ এ লং টাইম, লং ইনাফ টু ফরগেট মোস্ট থিংস। কিন্তু আমার অভিশপ্ত বন্ধুর বেলায় ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটল। কলকাতায় ফিরে এসে তার মনে হোলো ওই বাইরে কাটানো বিশ বছর মিথ্যা। বড়ো জোর অর্থহীন একটা বিরতি। তাই সে কলকাতায় এসেই সরলার খোঁজ করল। এর কাছে যায়, ওর কাছে যায়, কেউ জানে না। কার বয়ে গেছে বিশ বছর আগেকার কোন সরলার কথা মনে রাখতে? সুরেন সরলাদের সেই পুরানো

বাড়িওয়ালার কাছে গেল, বাড়ি এর মধ্যে পাঁচ বার হাত বদল হয়েছে। গেল পোস্ট অফিসে, সেখানেও কেউ জানে না। কুড়ি বছর আগের কথা কার মনে থাকবে? সুরেনেরও মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু সুরেন এ শহরে পা দেয়া মাত্র সারা কলকাতা যেন কথা ক'য়ে উঠল—এবং সেকথা একমাত্র সরলার। সুরেন অস্পষ্টভাবে সারাক্ষণ সে কথা শোনে, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারে না সরলাকে।"

পরিহাসের সময় নয় তখন, তবু ঘোষ এত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন যে আমি বললুম, "এ যে প্রায় সেই ইংরেজি ছবির শেষের দিকের চেজ্—সারা শহব ধাওয়া করছে একটি লোককে ধরতে।"

ঘোষ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "ঠিক উলটো। সারা শহর বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। শহর এক মুহূর্তের জন্যেও সবলার খোঁজ করেনি। খুঁজছিল শুধু একজন, এবং বাকি শহর তার সন্ধানের খবরও রাখেনি, সহযোগিতা করা তো দূরের কথা! শূন্যহৃদয় একটি লোক শুধু আরেকটি প্রাণীকে খুঁজে মরছিল, হৃদয়শূন্য শহর ছিল উদাসীন।"

আমার অপপ্রযুক্ত পরিহাস আমি ফিরিয়ে নিয়ে বললুম, "তারপর কী হোলো বলুন না। আই মাস্ট সে আই অ্যাম রাদার সরি ফর হিম।"

"প্লীজ। অনুকম্পায় ও আরো আহত হবে। কিন্তু ওই যা বলছিলুম, এখানে ওখানে সর্বত্র সরলাকে খুঁজতে খুঁজতে সুরেন প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেল। আই উড্‌ন্'ট্ সে হি ওয়েণ্ট রাউণ্ড দি বেণ্ড, অর্ এনিথিং লাইক দ্যাট। বাট হি সার্টেনলি সীজড টু বি হিজ নর্ম্যাল সেল্ফ্। হি ডিড থিংস হুইচ আই শুড হ্যাভ থট হি ওয়াজ দি লাস্ট ম্যান টু ডু—সিলি, ফুলিশ, স্টুপিড্, আনডিগনিফাইড, ডাউনরাইট ডিসগ্রেসফুল থিংস!"

ঘোষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। ক্রোধটা যেন একটু অতিকৃত মনে হোলো, অন্তত আমার কাছে। কোনো বন্ধুর উপর এত রাগ যেন স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া স্বরেনের জন্যে আমার একটু অনুকম্পাও ইতিমধ্যে সঞ্জাত হয়েছিল। আমি বললুম, "অত রাগ করবেন না, বেচারী সব কিছু সজ্ঞানে ভেবে চিন্তে করেনি, হয়তো না করে পারেনি। হয়তো করবার পরে ও নিজেই অনুতপ্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।"

"আই থিংক আই মাস্‌ট্‌ গ্রাণ্ট য়ু দ্যাট।" একটু থেমে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঘোষ বললেন, "বাট, ডু য়ু নো, নোবডি এল্‌স্‌ উইল!" ঘোষের স্বরে হতাশা ছিল। "সবাই একমত যে স্বরেনের তখনকার মানসিক অবস্থা আদৌ স্বাভাবিক ছিল না, সবাই দূর থেকে অল্পবিস্তর সমবেদনা জানিয়েছে স্বরেনের আড়ালে; কিন্তু স্বরেন যখনি একটু কিছু অন্যায় করেছে কারো প্রতি, তৎক্ষণাৎ সে বিরূপ হয়েছে, একবারও কেউ তখন ওর মনের অবস্থার কথা ভেবে ওকে ক্ষমা করেনি।" ঘোষ আবার বললেন, "অবশ্য স্বরেনের অভিযোগ নেই তা নিয়ে। ও নিজেই যে নিজেকে ক্ষমা করেনি!" ঘোষ থামলেন আরেকটা ব্র্যাণ্ডি চাইতে।

আমি এবারে উঠতে চাইছিলুম। আমার একটু তাড়া ছিল। সাড়ে সাতটায় আমার একটা জায়গায় উপস্থিত থাকতেই হবে। ···র সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। সে অপেক্ষা করবে। কিন্তু ঘোষকে সেকথা জানাবার দরকারও ছিল না, উপায়ও না; তাই বললুম, "কিন্তু স্বরেন এমনকী অন্যায় করেছে যে সবাই হয় তাকে দেখে হেসেছে বা তার উপর রাগ করেছে? এমন কিছু তো এখনো উল্লেখ করেননি যাতে—"

ঘোষ আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, "প্লীজ, ডোণ্ট আস্‌ক্‌ মি টু রিলেট

স্ক্যাট‍্সিলি, সেন্টিমেণ্টাল অ্যাণ্ড স্লাইটলি সর্ডিড স্টোরি। স্থরেনের নানা নির্বুদ্ধিতার বিশদ বিবরণ দিতে আমার লজ্জা করবে, দিলে স্থরেন আরো আঘাত পাবে। করেনি কী? নানা উপায়ে সরলার ঠিকানা বের করে তার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে, সময়ে-অসময়ে সরলাকে টেলিফোন করে কথা বলতে চেয়েছে, সরলা কথা না বলে টেলিফোন রেখে দিলেও বোকাটা দমেনি, আবার চেষ্টা করেছে, সরলার স্বামীর সঙ্গে একদিন টেলিফোনে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছে—অ্যাজ ইফ সে বেচারীর কোনো দোষ আছে!—; লজ্জার কথা, একদিন রাত্রে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও নাকি সরলাদের বাড়ির উলটো দিকের পেভমেণ্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অসহায় অভুক্ত ভিখারীর মতো। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ও নিজেও জানে না। পরে শুনেছে, সরলা নাকি ওকে দেখে ভেবেছিল ভূত দেখছে বা অমনি কিছু, ভয়ও নাকি পেয়েছিল, তাড়াতাড়ি জানলা থেকে সরে গিয়েছিল। স্থরেন কিছু লক্ষ্যও করেনি, একা সেই উলটো দিকের পেভমেণ্টে ঠায় দাঁড়িয়েছিল, মাঝে যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তাও জানতে পায়নি, অন্তত সেজন্যে ওখান থেকে সরে যাবার কথা ওর মনে হয়নি! অফ্ কোর্স, দে অল লাফড অ্যাট হিম হোয়েন দে নিউ অব ইট।”

ঘোষ গ্লাসের আড়ালে মুখ লুকালেন, স্থরেনের লজ্জা যেন ওঁর নিজের লজ্জা। গ্লাসের উপর আলো পড়ে আমার দেখায় ভুল হয়ে থাকবে, কিন্তু তখন যেন ঘোষের চোখে একটু অশ্রুর আভাস আমি লক্ষ্য করেছিলুম। ঘোষ আবার যখন তাঁর কথা স্থরু করলেন তখন তাঁর গলাও যেন একটু ভাঙা একটু বেস্থরো শোনাল।

ঘোষ বললেন, “অ্যাণ্ড সো, দ্যাট'স দ্যাট। স্থরেন—আদারওয়াইজ সো

ওয়াইজ, সো সেনসিবল, লেখাপড়া করে, যেখানেই কাজ করেছে সুনাম হয়েছে, এত ট্যালেণ্ট আছে যে কেউ কেউ তা জীনিয়স বলে ভুল করেছে কখনো কখনো, এ গুড ফ্রেণ্ড, এ ফরগিভিং এনিমি, কাজে ফাঁকি দেয় না, চমৎকার বলে, ওর ইংরেজি পড়লে বাঙালীর ইংরেজি বলে মনে হয় না, যারা বাঙলা পড়ে তাদের কাছে শুনেছি বাঙলাও নাকি মন্দ লেখে না—কিন্তু সব গুণ, অল দোজ অ্যাডমিরেবল কোয়ালিটিস অব দি হেড অ্যাণ্ড দি হার্ট সত্ত্বেও হি হ্যাজ ত্যাট ওয়ান অবসেশন। ট্রাই অ্যাজ হি মে, হি ক্যাননট গেট সরলা আউট অব হিজ সিস্টেম। এমনিতে বেশ সবায়ের সঙ্গে হাসছে, খেলছে, কথা বলছে, দিনের বেলায় অফিসে কাজ করছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে লণ্ডন থেকে প্যারিস চলে যাচ্ছে—ইফ সামথিং ব্রেকস দেয়ার—সেখান থেকে বার্লিনে বা অসলোতে, সব কিছু ঠিকমতো করে যাচ্ছে, যেন কিছুই হয়নি, অ্যাণ্ড ইয়েট, অ্যাণ্ড ইয়েট, সব সময় সরলার স্মৃতি মনেব অতি কাছে কোথাও রয়ে গেছে। একটু অসতর্ক হোলে, একটু হাসি বা কাজ বা খেলা থামালে অমনি সরলা আর সব সরিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে ওর সমস্ত চিত্ত অধিকার করে বসে, ওর সমগ্র সত্তা আচ্ছন্ন করে ফেলে। হল্যাণ্ডের ডাইক ভাঙলে ওদেশটার যেমন দশা হয়। সাধারণ কথাবার্তায় বা চলাফেরায় পর্যন্ত কোথায় যেন একটা স্ট্রেইনের আভাস আছে, যেন সর্বক্ষণ কী এক অবিশ্রাম চেষ্টায় কোন এক সর্বধ্বংসী বন্যা রোধ করে রেখেছে। একটু বিশ্রাম নিলে, প্রহরিতায় এক মুহূর্তের বিরাম হোলে, আর যেন রক্ষা নেই। সব ভেসে যাবে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এই নিরবচ্ছিন্ন টেনশনের চাপে ওর জীবনে আজ লেশমাত্র মাত্রাবোধ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ওর আতিশয্য। ও যখন সংযমী তখন ওর মতো অসামাজিক কেউ

নেই, আবার যখন উচ্ছৃংখলতার পর্যায় আসে তখন প্যারিসেও ওর এক্সেসেস কাছাকাছি কারো দৃষ্টি এড়ায় না। যখন কাজ করতে বসে তখন পারিপার্শ্বিক সব কিছুর প্রতি ন্যূনতম কর্তব্য পর্যন্ত বিস্মৃত হয়, যখন ছুটি নেয় তখন ওর উদ্দামতা আর সব উচ্ছৃংখল বন্ধুদের উৎসাহও ছাপিয়ে যায়। অ্যাণ্ড টুডে হি ইজ দি পার্মানেণ্ট ভিক্‌টিম অব ইটার্ণল ইম্‌ব্যালান্‌স্‌!"

আমি সহানুভূতিসূচক একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলুম। ঘোষ তার আগেই অবিশ্বাস্য তীব্রতাব সঙ্গে বললেন, "অ্যাণ্ড ডু য়ু নো দি বিগেস্ট মিস্টেক অব মাই লাইফ?"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "য়োর লাইফ? হাউ ডু য়ু মীন, আপনার জীবনের সঙ্গে—"

ঘোষ বললেন, "ইয়েস, অ্যাণ্ড ডু য়ু নো হোয়াট থ্যাট ওয়াজ? কেন আজো সরলার কথা সর্বক্ষণ মনের মধ্যে জ্বলছে? কেন ওব কথা মনে আছে, যখন আর সবায়ের নাম পর্যন্ত মনে নেই, লেট এলোন হ্যাভিং এনি ফীলিং? ওনলি ওয়ান ফেট্যাল ওমিশন। আই ডিড্‌নট্‌ গো টু বেড উইথ হার! তোমাদের সাহিত্যের অবিস্মরণীয় প্রথম প্রেম সম্বন্ধে এই হচ্ছে শেষ কথা। ব—য়, এক ডাব্‌ল ব্র্যাণ্ডি!"

মিথ্যা কথা। শত চিৎকার করে বললেও একথা সত্য নয়।

কিন্তু ঘোষের চিৎকার আমার কানে অসহ্য হয়ে বাজছিল। আমি তাই ওর অর্ডার সংশোধন করে বললুম, "বয়, এক নেই, দো, হাঁ, ডাবল্‌।"

---

